

প্রণবের অর্থবিকাশ

প্রণব । শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ-সরস্বতীকে বলিয়াছেন,

প্রণবের যেই অর্থ গায়ত্রীতে সেই হয় ।

সেই অর্থ চতুঃশ্লোকীতে বিবরিয়া কয় ॥ ২।২৫।৭৮

প্রণবের যাহা অর্থ, গায়ত্রীরও তাহাই অর্থ । সেই অর্থই শ্রীমদ্ভাগবতের চতুঃশ্লোকীতে বিস্তৃতরূপে প্রকাশ করা হইয়াছে ।

প্রণবের অর্থ সম্বন্ধে কয়েকটি শ্রুতিবাক্য এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে ।

“এতদৈ সত্যকাম পরধাপরধ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ ॥ প্রণোপনিষৎ ॥ ৫।২ ॥—হে সত্যকাম ! যাহা ওঙ্কার (প্রণব) বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহাই পরব্রহ্ম এবং অপর ব্রহ্ম ।”

মাণ্ডুক্য-উপনিষৎ বলেন—“ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সৰ্বং তস্মোপব্যাখ্যানম্ । ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি সৰ্বমোঙ্কার এব । যচ্চ অচ্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপি ওঙ্কার এব ॥ ১ ॥—এই পরিদৃশ্যমান জগৎ “ওম্”—এই অক্ষরাত্মক । তাহার সুস্পষ্ট বিবরণ এই যে—ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান, এই সমস্ত বস্তুই ওঙ্কারাত্মক এবং কালত্রয়াতীত আরও যাহা কিছু আছে, তাহাও এই ওঙ্কারই ।”

“সৰ্বং হি এতদ্ ব্রহ্ম, অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম ॥ ২ ॥—এই পরিদৃশ্যমান সমস্তই ব্রহ্ম ; এই আত্মাও ব্রহ্ম ।”

“এষ সৰ্বেশ্বর এষ সৰ্বজ্ঞ এষ অন্তর্যামী এষ যোনিঃ সৰ্বশ্চ প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্ ॥ ৬ ॥—ইনি (এই ওঙ্কার) সৰ্বেশ্বর, ইনি সৰ্বজ্ঞ, ইনি অন্তর্যামী, ইনি যোনি (সমস্তের কারণ) ; ইনি সমস্তভূতের উৎপত্তি ও বিলয় স্থান ।”

তৈত্তিরীয় উপনিষৎ বলেন—“ওম্ ইতি ব্রহ্ম । ওম ইতি ইদং সৰ্বম্ ॥ ১।৮ ॥—ওঙ্কারই ব্রহ্ম । ওঙ্কারই এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ॥”

উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যগুলি হইতে প্রণবসম্বন্ধে যাহা জানা গেল, তাহা মোটামুটি এই :—

(ক) প্রণবই ব্রহ্ম । প্রণব সৰ্বেশ্বর, সৰ্বজ্ঞ, অন্তর্যামী এবং সৰ্বযোনি ।

(খ) প্রণবই এই পরিদৃশ্যমান জগৎ । ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান—সমস্তই প্রণব, অর্থাৎ এই পরিদৃশ্যমান জগৎ অতীতে যাহা ছিল, বর্তমানে যেক্রপ আছে এবং ভবিষ্যতে যেক্রপ হইবে, তৎসমস্তই প্রণব বা প্রণবাত্মক ব্রহ্ম । ইহা হইতে বুঝা গেল, পরিদৃশ্যমান জগৎ সকল সময়েই কালের প্রভাবাধীন ।

প্রণব বা ব্রহ্মই এই কালপ্রভাবাধীন পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং ব্রহ্ম হইতেই এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয় ।

(গ) প্রণব এই কাল-পরিণামী পরিদৃশ্যমান জগৎ হইলেও স্বয়ং কিন্তু কালাতীত এবং পরিদৃশ্যমান জগতের বাহিরেও অবস্থিত । প্রণব কালাতীত হওয়াতে তাহার উপর কালের প্রভাব নাই ; সুতরাং প্রণব নিত্য ।

(ঘ) প্রণব জগতের যোনি বলিয়া এবং প্রণবই জগৎ বলিয়া জগতের অধিষ্ঠানও প্রণবই । সুতরাং পরিদৃশ্যমান জগতের স্থানেও প্রণব আছেন—কিন্তু কালাতীত ভাবে ।

মন্তব্য । (ঙ) কালপরিণামী জগতের অধিষ্ঠান হইয়াও প্রণব কালাতীত । ইহাতেই ধ্বনিত হইতেছে যে—জগতের সঙ্গে প্রণবের স্পর্শ নাই ; সুতরাং প্রণব এবং জগৎ একজাতীয় বস্তু নহে ; অর্থাৎ জগৎ যে জাতীয় বস্তু, প্রণব তাহার বিরুদ্ধজাতীয় বস্তু । দেখা যাইতেছে, জগৎ জড়বস্তু ; সুতরাং প্রণব বা ব্রহ্ম হইবে জড়বিরোধী বস্তু । জড়বস্তুর উপরই কালের প্রভাব । জড়বিরোধী বস্তুর উপর কালের প্রভাব নাই । জড়বিরোধী বস্তু হইল—চিৎ । সুতরাং প্রণব বা ব্রহ্ম হইলেন চিদ্রবস্তু ।

(চ) প্রণবই জগতের যোনি, প্রণব হইতেই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়। সুতরাং প্রণবই জগতের সর্ববিধ কারণ—নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণ। আবার জগৎকেই যখন ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায়, ব্রহ্মই জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন। কুন্তকারও ঘটের (নিমিত্ত) কারণ এবং মাটিও ঘটের (উপাদান-) কারণ। তথাপি কিন্তু ঘটকে মাটিই বলে, কুন্তকার বলে না—ঘট মাটিরই পরিণতি বলিয়া। তদ্রূপ প্রণব এই জগতের উপাদান কারণ বলিয়া এবং প্রণবই জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন বলিয়া প্রণবই জগৎ—একথা বলা হইয়াছে। ইহাতে পরিণাম-বাদের ইঙ্গিত পাওয়া গেল।

(ছ) প্রণব হইতে জগতের উৎপত্তি-আদি এবং প্রণব সর্বজ্ঞ, সর্বেশ্বর এবং অন্তর্যামী। সুতরাং প্রণব বা ব্রহ্ম সবিশেষ বস্তু। এস্থলে শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরেই ব্রহ্মের সবিশেষত্বের কথা বলিলেন। প্রণবের স্বরূপ-কথনেই প্রণবের সবিশেষত্বের স্পষ্টোক্তি থাকাতে সবিশেষত্বই প্রণবের বা ব্রহ্মের তত্ত্ব।

(জ) উল্লিখিত শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল, পরিদৃশ্যমান জগতের সহিত (সুতরাং জগতিস্থ জীবের সহিতও) প্রণবের বা ব্রহ্মের একটা নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। তাই প্রণব বা ব্রহ্মই হইল সম্বন্ধ-তত্ত্ব।

(ঝ) জগতিস্থ জীব ব্রহ্মের সহিত তাহার নিত্য অচ্ছেদ্য সম্বন্ধের কথা ভুলিয়া গিয়াছে। কেন এবং কিরূপে ভুলিয়া গিয়াছে, তাহার কোনও স্পষ্ট উল্লেখ উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে দৃষ্ট হয় না। তবে জগৎকে কালপরিণামী বলাতে তাহার একটু ইঙ্গিত যেন পাওয়া যায়।

(ঞ) ব্রহ্মের সহিত জীবের সম্বন্ধ যখন নিত্য এবং অচ্ছেদ্য, তখন যে কারণে এই সম্বন্ধের বিস্মৃতি জন্মিয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই আগন্তুক কারণ হইবে এবং আগন্তুক বলিয়া তাহাকে অপসারিত করা সম্ভব—অর্থাৎ সম্বন্ধের স্মৃতিকে উদ্ধুদ্ধ করা সম্ভব।

(ট) কিন্তু কি উপায়ে সম্বন্ধের স্মৃতিকে উদ্ধুদ্ধ করা সম্ভব হইতে পারে? এখন ব্রহ্মকে আমরা জানি না, তাই তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ কি, তাহাও আমরা জানি না। তাঁহাকে জানিলেই সম্বন্ধের জ্ঞান উদ্ধুদ্ধ হইবে। কিন্তু তাঁহাকে জানিবার উপায় কি? তাহাই নিম্নোক্ত শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়।

ছান্দোগ্য উপনিষদ বলিতেছেন—“ওম্ ইত্যেতদ্ অক্ষরম্ উদগীথম্ উপাসীত ॥ ১।১।১ ॥—ওম্—এই অক্ষররূপী অক্ষরের উপাসনা করিবে।”

কঠোপনিষৎ বলেন—“সর্ষে বেদা যৎপদম্ আনমন্তি, তপাংসি সর্বাণি চ যদ্ বদন্তি। যদ্ ইচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যাং চরন্তি তন্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি ওম্ ইত্যেতৎ ॥ ২।১৫ ॥—সমস্ত বেদ ষাঁহার পদে সম্যাক্রূপে নমস্কার করে (প্রাপ্তব্যরূপে ষাঁহাকে প্রতিপন্ন করে), সমস্ত তপস্কাই ষাঁহার কথা বলিয়া থাকে (ষাঁহাকে পাওয়ার জন্য সমস্ত প্রকার তপস্কা অমুষ্ঠিত হয়), ষাঁহাকে পাওয়ার ইচ্ছায় ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালিত হয়, তাঁহার কথা তোমাকে (নচিকেতাকে) আমি (যম) সংক্ষেপে বলিতেছি। তিনিই এই ওঙ্কার।”

“এতদ্ হি এব অক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ হি এব অক্ষরং পরম্। এতদ্ হি এব অক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদ্ ইচ্ছতি তন্ত তৎ ॥ ২।১৬ ॥—এই অক্ষরই (ওম্ এই অক্ষরই) (অপর) ব্রহ্ম, এই অক্ষরই পর (ব্রহ্ম)। এই ওঙ্কাররূপ অক্ষরকে জানিলেই যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই পাইতে পারেন।”

“এতদ্ আলম্বনং শ্রেষ্ঠম্ এতদ্ আলম্বনং পরম্। এতদ্ আলম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ২।১৭ ॥—ব্রহ্ম প্রাপ্তির যত রকম আলম্বন আছে, এই ওঙ্কারাক্ষরই তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহাই পরম-আলম্বন। এই ওঙ্কাররূপ আলম্বনকে জানিতে পারিলে ব্রহ্মলোকে (ব্রহ্মধামে) মহীয়ান হইতে পারা যায়।”

পাতঞ্জল-দর্শন বলেন—“ঈশ্বর-প্রণিধানাদ্ বা—ঈশ্বর প্রণিধান দ্বারাও (চিত্তবৃত্তি-নিরোধ হইতে পারে। সেই প্রণিধান কিরূপ, তাহা বলিতেছেন)। তজ্জপঃ তদর্থভাবনম্ ॥ সমাধিপাদ। ২৮ ॥—তাঁহার (ঈশ্বরের) জপ, তাঁহার অর্থচিন্তা। (কি জপ করা হইবে?)। তন্ত বাচকঃ প্রণবঃ ॥ সমাধিপাদ। ২৭ ॥—প্রণবই ঈশ্বরের বাচক (নাম)।”

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ বলেন—স্বদেহমরণিং কৃদ্ধা প্রণবক্ণোত্তরারণি। ধ্যাননির্ম্মথনাত্যাসাৎ দেবং পশ্চৈম্নি-
গুটবৎ ॥ ১১৪ ॥—নিজের দেহকে একটি অরণি এবং প্রণবকে অপর এক অরণি করিয়া ধ্যানরূপ নির্ম্মথন
(ঘর্ষণ) অভ্যাস করিলে নিজ দেহমধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত আগ্নাকে দর্শন করা যায়। (পুরাকালে ঋষিগণ
ছুইখণ্ড কাষ্ঠ লইয়া ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিতেন। এই কাষ্ঠখণ্ডদ্বয়কে অরণি বলা হইত)।

কৈবল্যোপনিষৎও ঐ কথাই বলেন—“স্বদেহমরণিং কৃদ্ধা প্রণবক্ণোত্তরারণি। ধ্যাননির্ম্মথনাত্যাসাৎ পাশং
দহতি পণ্ডিতঃ ॥ ১১ ॥—পণ্ডিত ব্যক্তি স্বীয় দেহকে এক অরণি এবং প্রণবকে অপর এক অরণি করিয়া ধ্যানরূপ
নির্ম্মথনদ্বারা (সংসার-) পাশ দগ্ধ করেন।”

মাণ্ডুক্যোপনিষদের গৌড়পাদীয়-কারিকাও বলেন—“যুজীত প্রণবে চেতঃ প্রণবো ব্রহ্ম নির্ভয়ম্।* প্রণবে
নিত্যযুক্তশ্চ ন ভয়ং বিজ্ঞতে কচিৎ ॥ ২৫ ॥—প্রণবে চিত্ত সমাহিত করিবে; কারণ, প্রণবই অভয়-ব্রহ্ম-স্বরূপ।
যিনি সর্বদা প্রণবে সমাহিত চিত্ত, তাহার কোথাও ভয় থাকে না।”

“সর্বত্র প্রণবো হাদির্দ্রশ্যমন্তুপৈবচ। এবং হি প্রণবং জ্ঞাত্বা ব্যপ্নুতে তদনন্তরম্ ॥ ২৭ ॥—প্রণবই সকলের
আদি, মধ্য ও অন্ত। এতাদৃশ প্রণবকে জানিলেই সেই ব্রহ্মকে পাওয়া যায়।”

“প্রণবং হীম্বরং বিজ্ঞাৎ সর্বত্র হৃদি সংস্থিতম্। সর্বব্যাপিনমোক্ষারং মহা বীরো ন শোচতি ॥ ২৮ ॥—প্রণবকেই
ঈশ্বর বলিয়া জানিবে। দীর্ঘ ব্যক্তি সর্বব্যাপী ওক্ষারকে জানিয়া শোকাভীত হন।”

উল্লিখিত বাক্যগুলি হইতে যাহা জানা গেল, তাহার মর্ম্ম এই :—

(১) প্রণবকে বা ব্রহ্মকে জানিলে যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই পাইতে পারেন। সম্বন্ধজ্ঞানও উদ্বুদ্ধ
হইতে পারে—সাধক ইচ্ছা করিলে।

(২) জানিবার উপায় হইল—প্রণবের উপাসনা, ধ্যান, প্রণবে মনঃসংযোগ, প্রণবকে শ্রেষ্ঠ-আলম্বনরূপে
গ্রহণ করা, প্রণবকেই ঈশ্বর (সর্বৈশ্বর) রূপে মনে করা, তপস্যা করা, ব্রহ্মচর্য্য পালন করা ইত্যাদি।

(৩) শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিতে এবং কৈবল্যশ্রুতিতে জীবের দেহদ্বারা (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সহায়তায়) উপাসনার
কথা স্পষ্টভাবেই উল্লিখিত হইয়াছে।

(৪) উপাসনার বা সাধনের উপদেশেই শ্রুতিতে অভিধেয়-তত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে।

(৫) উপাসনার কয়েকটি ফলের কথাও বলা হইয়াছে। উপাসনার ফলে যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহা
পাইতে পারেন; ওক্ষাররূপ ব্রহ্মের লোকে যাইয়াও মহীয়ান্ হইতে পারেন; নির্ভয় হইতে পারেন, শোকাভীত
হইতে পারেন, সংসার-পাশ ছেদন করিতে পারেন; ইত্যাদি।

(৬) সাধনের ফলের উল্লেখে শ্রুতিতে প্রয়োজন-তত্ত্বের কথাই বলা হইয়াছে।

মন্তব্য। (৭) উপাসনামূলক শ্রুতিবাক্যগুলিতেও প্রণবের স্বরূপের উল্লেখ আছে। ইহা স্বাভাবিকই।

(৮) পূর্বে উল্লিখিত প্রাণোপনিষদের বাক্যে প্রণবকে পরব্রহ্ম এবং অপরব্রহ্ম বলা হইয়াছে। কালের
প্রভাবাধীন পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং তৎসংশ্লিষ্টবস্তুই অপর ব্রহ্ম; আর কালাতীত চিৎস্বরূপ ব্রহ্মই পরব্রহ্ম। উল্লিখিত (৩)
অনুচ্ছেদে উপাসনার যে কয়েকটি ফলের কথা বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে একটি হইল—যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহা
পাইতে পারেন। যিনি অপর ব্রহ্ম পাইতে ইচ্ছা করেন (অর্থাৎ মনুষ্যলোকের সুখভোগাদি, স্বর্গাদি লোকের
সুখভোগাদি যাহা ইচ্ছা করেন), তিনি তাহা পাইতে পারেন। এসমস্ত কালের প্রভাবাধীন বলিয়া অনিত্য।
আর যিনি পরব্রহ্মকে পাইতে ইচ্ছা করেন, তিনি তাহাও পাইতে পারেন—ব্রহ্মলোকেও (ব্রহ্মের ধামেও) যাইতে
পারেন। ব্রহ্মলোক কালাতীত, স্থতরাং নিত্য। তাই পরব্রহ্মপ্রাপ্তিরই বাস্তব-পুরুষার্থতা আছে।

(৯) উপাসনার যত রকম প্রকার-ভেদ আছে, তাহাদের মধ্যে প্রণবকেই সর্বশ্রেষ্ঠ আলম্বন বলা হইয়াছে।
প্রণব ব্রহ্মও বটেই, আবার ব্রহ্মের বাচকও (বা নামও) বটেই। নাম ও নামীতে যে অভেদ, তাহাও এস্থলে জানা
গেল। আবার সাধনের মধ্যে নামই যে সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন, তাহাও জানা গেল।

(প) প্রণবই যে সমস্ত বেদের প্রতিপাদ—সুতরাং সম্বন্ধতত্ত্ব—কঠোপনিষদের উক্তি হইতে তাহাও জানা গেল।

উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যগুলিতে অনেকগুলি বিষয় প্রচ্ছন্ন আছে—বীজের মধ্যে বৃক্ষের ছায়। বস্তুতঃ প্রণব বীজস্বরূপই। প্রণব হইতেই বেদাদি সমগ্র শাস্ত্রের অভিব্যক্তি।

প্রণবের অর্থসম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপরে প্রদত্ত হইল। এক্ষণে গায়ত্রীর অর্থালোচনার চেষ্টা করা যাইতেছে।

গায়ত্রী। মূল-গায়ত্রীমন্ত্রটি হইতেছে এই—“তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবশ্চ ধীমহি ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ।”

ইহা মূল গায়ত্রী হইলেও ইহার আরও দুইটি অঙ্গ আছে—ব্যাহতি ও শিরঃ। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্যম্—এই সাতটি হইল ব্যাহতি। তন্মধ্যে ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বঃ এই তিনটি হইল মহাব্যাহতি। আর আপঃ, জ্যোতিঃ, রসঃ, অমৃতম্, ব্রহ্ম, ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, ওম্ ইহারা গায়ত্রীর শিরঃ।

শ্রীপাদশঙ্কর বলেন—প্রণবযুক্ত, ব্যাহতিযুক্ত এবং শিরোযুক্ত গায়ত্রীই সমস্তবেদের সার। “গায়ত্রীং প্রণবাদি-সপ্তব্যাহত্যাপেতাং শিরঃসমেতাং সর্ববেদসারমিতি বদন্তি।”

প্রণব, ব্যাহতি এবং শিরঃ—এই তিন বস্তু সমন্বিত সর্ববেদসার গায়ত্রীর রূপ হইবে এই :—“ওঁ ভূঃ, ওঁ ভুবঃ, ওঁ স্বঃ, ওঁ মহঃ, ওঁ জনঃ, ওঁ তপঃ, ওঁ সত্যম্, ওঁ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবশ্চ ধীমহি ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ, ওঁ আপোজ্যোতীরসোহমৃতং ব্রহ্ম ভূভুবঃ স্বরোম্।”

উহাই গায়ত্রীর পূর্ণরূপ হইলেও সাধারণতঃ পূর্ণরূপের জপ করা হয় না। মন্ত্র বলেন—“এতদক্ষরমেতাঞ্চ জপন্ ব্যাহতি-পূর্ষিকাম্। সন্ধ্যারোহর্কেদবিদ্বিপ্রো বেদপুণ্যেন যজ্যতে ॥—প্রণবযুক্তা ব্যাহতিপূর্ষিকা গায়ত্রীমন্ত্র দুই সন্ধ্যায় জপ করিলে বেদবিদ্বি প্রিন্ত বেদপাঠের পুণ্য লাভ করেন।”

শ্রীপাদশঙ্করও বলেন—“সপ্রণব-ব্যাহতিত্রয়োপেতা প্রণবাস্তা গায়ত্রী জপাদিভিঃ উপাস্তা—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ এই তিনটি ব্যাহতিযুক্তা গায়ত্রীর পূর্বে ও পরে প্রণবযোগ করিয়া জপাদি দ্বারা উপাসনা করিবে।

তাহা হইলে সাধারণতঃ জপের জন্ত গায়ত্রীর রূপ হইল এই :—“ওঁ ভূভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবশ্চ ধীমহি ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।”

গায়ত্রী-শব্দের অর্থ ব্যাসদেব এইরূপ বলেন—“গায়ন্তং ত্রায়সে যস্মাৎ গায়ত্রী স্বং ততঃ স্মৃতা।—যিনি তোমার গান (কীর্তন) করেন, তাঁহাকে ত্রাণ কর বলিয়া তোমার নাম গায়ত্রী”।

বৃহদারণ্যক-শ্রুতি বলেন—“স ইয়ং গয়াংস্তত্রে প্রাণা বৈ গয়াস্তং প্রাণান্ত্রে তন্ যদ্ গয়াংস্তত্রে তস্মাৎ গায়ত্রী নাম ॥ ৫।১৪।৪ ॥ (গয়া এব গয়াঃ, গয়স্বার্থে ঋ, গয়ান্ প্রাণান্ ত্রায়তে ইতি গায়ত্রী।—প্রাণসমূহকে ত্রাণ করে বলিয়া গায়ত্রী নাম হইয়াছে। গায়-শব্দের অর্থ—প্রাণ।”

ঋক, যজু ও সাম—এই তিন বেদেই গায়ত্রী দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদে—৩।৪।১০; যজুর্বেদে ৩।৩৫; সামবেদে—৬।৩।১০।

মূল গায়ত্রীমন্ত্রের অর্থ শ্রীপাদ সায়নাচার্য্য এইরূপ করিয়াছেন। “যঃ” সবিতাদেবঃ “নঃ” অশ্বাকম্ “ধিয়ঃ” কর্ম্মাণি ধর্ম্মাদিবিষয়া বা বুদ্ধিঃ “প্রচোদয়াৎ” প্রেরয়েৎ, “তৎ” তত্ত্ব “দেবশ্চ সবিতুঃ” সর্বাস্তুর্য্যামিতয়া প্রেরকস্ত জগৎশ্রষ্টুঃ পরমেশ্বরশ্চ আত্মভূতশ্চ “বরেণ্যং” সর্বেকপাশ্চতয়া জ্ঞেয়তয়া চ সম্ভজনীয়ং “ভর্গঃ” অবিজাতংকার্য্যয়োঃ ভজ্ঞানাং ভর্গঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ পরব্রহ্মাত্মকং তেজঃ “ধীমহি” ধ্যামেম। (ভর্গম্—অসৃজ্ + অস্মন্; ক্রীবলিঙ্গ)।

সায়নাচার্য্যের ব্যাখ্যা অনুসারে গায়ত্রীমন্ত্রের অর্থ হইবে এইরূপ :—যঃ নঃ ধিয়ঃ প্রচোদয়াৎ, তৎ দেবশ্চ সবিতুঃ বরেণ্যং ভর্গঃ ধীমহি।

সায়নাচার্য্যের ভাষ্যানুসারে গায়ত্রীমন্ত্রের অর্থ হইল এইরূপ—“যে সবিতাদেব আমাদের কর্মসমূহকে অথবা ধর্মাদিবিষয়ে বুদ্ধিসমূহকে প্রেরণ করেন (যিনি আমাদের ধর্ম-কর্ম-বিষয়িণী বুদ্ধির প্রেরক, যাহার প্রেরণায় বা কৃপায় আমরা ধর্মবিষয়িণী বা কর্মবিষয়িণী বুদ্ধি পাইয়া থাকি), সেই সর্বাস্তর্য্যামী বুদ্ধি-প্রেরকের, সেই জগৎ-স্রষ্টার, সেই আত্মভূত পরমেশ্বরের—সকলের উপাস্ত্র এবং সকলেরই জ্ঞেয় বলিয়া সকলেরই সম্যকরূপে ভজনীয় ভগ্নকে, অর্থাৎ, অবিজ্ঞা এবং অবিজ্ঞার কার্য্যকে সম্যকরূপে দূরীভূত করিতে (ধানকে আগুনের উপরে খোলার ভাজিয়া ফেলিলে তাহার যেমন আর অঙ্কুরোদগমের সম্ভাবনা থাকে না, তজ্জপ মায়া এবং মায়ার কার্য্যকে ফল প্রদানে সম্যকরূপে অসমর্থ করিতে) সমর্থ স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মাত্মক তেজকে ধ্যান করি” ।

এই অর্থকে আর একটু পরিস্ফুট করিলে দাঁড়ায় এইরূপ।—আমরা তাঁহার তেজকে (অর্থাৎ শক্তিকে) ধ্যান করি। কি রকম তেজ? স্বয়ংজ্যোতীরূপ—স্বপ্রকাশ, যাহা নিজকেও প্রকাশ করিতে পারে, অপরকেও প্রকাশ করিতে পারে—সূর্য্যের জ্বালা। আর কি রকম? পরব্রহ্মাত্মক তেজ—পরব্রহ্মই আত্মা বা অধিষ্ঠান যাহার, সেই তেজ বা শক্তি। স্বপ্রকাশ বলিয়া এই তেজ বা শক্তি হইল চিচ্ছক্তি; আর পরব্রহ্মে তাহার অধিষ্ঠান বলিয়া এই তেজ হইল পরব্রহ্মের স্বরূপশক্তি—যাহাকে শ্বেতাস্থতর-শ্রুতি “স্বাভাবিকী পরাশক্তি” বলিয়াছেন তাহা। “পরাস্ত্র শক্তির্বিবিধৈব শ্রয়তে। স্বাভাবিকী জ্ঞানবল ক্রিয়াচ। শ্বেতা। ৬।৮॥”

এই তেজ বা পরব্রহ্মের স্বরূপশক্তি আবার কি রকম? ভগ্ন শব্দে তাহা প্রকাশ করা হইয়াছে। তেজ না বলিয়া ভগ্ন বলার একটা তাৎপর্য্য আছে। ভস্মজ-ধাতু হইতে ভগ্ন শব্দ নিষ্পন্ন। ভস্মজ-ধাতুর অর্থ ভাজা—আগুনের উপরে খোলা চড়াইয়া তাহাতে যেমন ধান বা ডাইল ভাজা হয়। যে ধানকে বা ডাইলকে খোলায় ভাজা হয়, তাহা হইতে আর অঙ্কুর জন্মে না—ইহাই ভস্মজ (ভাজা) ধাতুর তাৎপর্য্য। অবিজ্ঞাকে এবং অবিজ্ঞার কার্য্যকে ধানের বা ডাইলের মত করিয়া ভাজিতে পারে যে তেজঃ, তাহাকেই “ভগ্নঃ—তেজঃ” বলা হয়। অবিজ্ঞার বা মায়ার আবরণাচ্ছিকা শক্তি আমাদের স্বরূপের স্মৃতিকে এবং পরব্রহ্মের সহিত আমাদের সম্বন্ধের স্মৃতিকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে—স্বরূপের এবং সম্বন্ধের জ্ঞানকে ভুলাইয়া রাখিয়াছে এবং তাহার বিক্ষেপাচ্ছিকা শক্তিতে দেহাত্মবুদ্ধি জন্মাইয়া দেহেতে আমাদের আবেশ জন্মাইয়াছে। তাহার ফল হইয়াছে—আমাদের সংসার-বন্ধন, পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু। পরব্রহ্মের এই তেজ বা স্বরূপশক্তি এই মায়াকে এবং তাহার কার্য্যকে (অর্থাৎ আমাদের স্বরূপের এবং পরব্রহ্মের সহিত আমাদের সম্বন্ধের জ্ঞানহীনতাকে এবং আমাদের দেহাবেশকে) ভাজিয়া দিতে পারে—একেবারে নিঃশক্তিক করিয়া দিতে পারে; মায়ার কবল হইতে সম্যকরূপে মুক্ত করিয়া আমাদের সংসার-বন্ধন চিরকালের জগু ছিন্ন করিয়া দিতে পারে। তাই পরব্রহ্মের এই তেজকে (স্বরূপশক্তিকে) ভগ্ন বলা হইয়াছে।

এত মহাত্মা যাহার তেজের বা শক্তির, তিনি কি রূপ? তৎ দেবস্ত্র সবিভুঃ—তিনি সবিতাদেব। তিনি জগৎ-প্রসবিতা, জগতেব সৃষ্টিকর্তা, সকলের অন্তর্য্যামী, সকলের বুদ্ধির প্রেরক; তিনি পরমেশ্বর—তাঁহা অপেক্ষা বড় ঈশ্বর (শক্তিশালী) আর কেহ নাই, তিনি আত্মভূত—পরমাত্মা, পরব্রহ্ম—শ্রুতি যাহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—“ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে ॥ শ্বেতাস্থর ॥ ৬।৮ ॥”, এবং “এষঃ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষ অন্তর্য্যামী এষ যোনিঃ সর্ব্বস্ত্র প্রভবাণ্যর্যো হি ভূতানাম্ ॥ মাণ্ডুক্য ॥৬॥” এই সবিতাদেবই তিনি। দেব-শব্দে তাঁহার স্বপ্রকাশতা (দিব, দীপ্তো) এবং সচ্চিদানন্দত্বও সূচিত হইতেছে।

তিনি “নঃ ধিয়ঃ প্রচোদয়াৎ”—আমাদের বুদ্ধির (ধী-অর্থ—বুদ্ধি) প্রেরক। কোন্ বুদ্ধির প্রেরক তিনি? ধর্ম-কর্মাদি যাহাই কিছু আমরা করিনা কেন, তজ্জন্ত যে বুদ্ধির প্রয়োজন হয়, সেই বুদ্ধি তিনিই দিয়া থাকেন। (জীবতত্ত্ব প্রবন্ধে ঈশ্বরাদীন কর্তৃত্ব অংশ দ্রষ্টব্য)।

তাহা হইলে সায়নাচার্য্যের ভাষ্যানুসারে গায়ত্রীমন্ত্রের স্থূল তাৎপর্য্য হইল এই—যিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা, যিনি আমাদের অন্তর্য্যামী এবং সর্ব্ববিষয়িণী বুদ্ধির প্রেরক, যিনি সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর এবং যাহার

স্বরূপশক্তি মায়াকে এবং মায়ার প্রভাবকে সম্যকরূপে অপসারিত করিতে সমর্থ, তাঁহার স্বরূপ-শক্তিকে আমরা ধ্যান করি।

সায়নাচার্য্য গায়ত্রীর চারিপ্রকার অর্থ করিয়াছেন, প্রথম প্রকার অর্থের কথা বলা হইয়াছে। প্রথম প্রকারের অর্থে তৎ-শব্দকে তত্ত্ব অর্থে সবিভূঃ-এর বিশেষণ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রকারের অর্থে তৎ-শব্দকে “ভর্গঃ” এর বিশেষণ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রকারের অর্থে—গায়ত্রীর অর্থ হইবে এইরূপ :—যং ভর্গঃ নঃ ধিয়ঃ প্রচোদয়াৎ, দেবস্ত সবিভূঃ তৎ বরেণ্যং ভর্গঃ ধীমহি। এইরূপ অর্থেরও শব্দসমূহের অর্থ প্রথম প্রকারের অর্থের শব্দসমূহের অর্থের অনুরূপই হইবে। কেবল পরমেশ্বরকে বুদ্ধির প্রেরক না বলিয়া এস্থলে পরমেশ্বরের ভর্গ বা তেজকে বুদ্ধির প্রেরক বলা হইয়াছে। আর সমস্ত প্রথম প্রকারের অর্থের অনুরূপ। প্রথম প্রকারের এবং দ্বিতীয় প্রকারের অর্থে তাৎপর্য্যের কোনও পার্থক্য নাই।

সায়নের তৃতীয় প্রকারের অর্থ সূর্য্যবিষয়ক। “যঃ” সবিভা—সূর্য্যঃ “ধিয়ঃ” কক্ষাণি “প্রচোদয়াৎ” প্রেরয়তি, তত্ত্ব “সবিভূঃ” সর্ব্বস্ত প্রসবিভূঃ “দেবস্ত” জ্যোতমানস্ত সূর্য্যস্ত “তৎ” সর্কৈঃ দৃশ্যমানতয়া প্রসিদ্ধং “বরেণ্যং” সর্কৈঃ সম্ভজনীয়ং “ভর্গঃ” পাপানাং তাপকম্ তেজোমণ্ডলং “ধীমহি” ধ্যেয়তয়া মনসা ধারয়েম।

এস্থলে ধী-শব্দের অর্থ করা হইয়াছে—কর্ম্ম। আর তাহার প্রেরক বা প্রবর্তক—সবিভা বা সূর্য্য। সূর্য্যোদয়েই লোকের কর্ম্ম আরম্ভ হয় ; তাই সূর্য্যকে কর্ম্মের প্রবর্তক বলা হইয়াছে। ভর্গ-শব্দের অর্থ হইয়াছে—সূর্য্যের তেজোমণ্ডল। সকলেই এই সূর্য্যতেজ চাহিয়া থাকে, কেহ অন্ধকারে থাকিতে চায় না—কেবল অন্ধকারে কেহ বাঁচিতেও পারে না। তাই এই ভর্গ—সূর্য্যের তেজোমণ্ডল হইল বরেণ্য—প্রার্থনীয়, কাম্য। সূর্য্য হইতে এই জগতের—আমাদের এই পৃথিবীর এবং পৃথিবীস্থ বস্তুসমূহের—উদ্ভব বলিয়া সূর্য্যের নাম সবিভা—জগৎ-প্রসবিভা। এইরূপে সায়নাচার্য্যকৃত গায়ত্রীর তৃতীয় অর্থের তাৎপর্য্য হইল এইরূপ—যে সূর্য্য হইতে জগতের উদ্ভব, যে সূর্য্য আমাদের কর্ম্মের প্রবর্তক, সেই সূর্য্যের তেজোমণ্ডলকে—যে তেজোমণ্ডল সকলেই দেখে এবং সকলেরই কাম্য, সেই তেজোমণ্ডলকে—ধ্যয় বস্তু বলিয়া আমরা মনে ধারণা করি।

সায়নাচার্য্যের চতুর্থ রকমের অর্থে ভর্গঃ-শব্দের অর্থ করা হইয়াছে—অন্ন, আর ধী-শব্দের অর্থ করা হইয়াছে—কর্ম্ম। “ভর্গঃশব্দেন অন্নমভিধীয়তে। যঃ সবিভা দেবঃ ধিয়ঃ প্রচোদয়তি তত্ত্ব প্রসাদাৎ অন্নাদিলক্ষণং ফলং ধীমহি ধারণামঃ তত্ত্ব আধারভূতাঃ ভবেম ইত্যর্থঃ। ভর্গঃশব্দস্ত অন্নপরন্তে ধীশব্দস্ত চ কর্ম্মপরন্তে চ আধার্কণমিত্যাদি।”

এস্থলেও সবিভা-অর্থ—সূর্য্য। প্রথম তিন প্রকারের ব্যাখ্যায় ধীমহি ক্রিয়াপদ ধ্যানার্থক “ধৈ”-ধাতু হইতে এবং চতুর্থ প্রকারের অর্থে আধারার্থক “ধীড্”-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে করা হইয়াছে। চতুর্থ প্রকারের অর্থের তাৎপর্য্য এই—যে সূর্য্যদেব আমাদের সমুদয় কর্ম্মের প্রবর্তক, তাঁহার প্রসাদ আমরা যেন অন্নাদিরূপ ফল ধারণ করিতে পারি।

তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকারের অর্থ পরব্রহ্ম বিষয়ক নয়।

এক্ষণে গায়ত্রীর ব্যাঙ্গতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্যম্—এই সাতটি ব্যাঙ্গতিতে সপ্তলোক বুঝাইতেছে। প্রণবের অর্থে যাহাকে কেবল “ইদম্—ইহা” বলা হইয়াছে, যেন পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াই “ইদম্—ইহা” বলা হইয়াছে, কোনও নাম করা হয় নাই, গায়ত্রীতে তাহারই নামোন্মেষ করা হইয়াছে—ভূঃ, ভুবঃ-ইত্যাদি। ভূভুবাদি সাতটি লোককেই ওম্-এর অর্থে “ইদম্—ইহা” বলা হইয়াছে। এই সাতটিও প্রণবই—ব্রহ্মই—প্রণবের বা ব্রহ্মের পরিণতি। এই সপ্তলোকও ব্রহ্মাত্মক বলিয়া এই সপ্তলোক ব্যাপিয়াও ব্রহ্ম বিরাজিত, তাহাই সূচিত হইল। গায়ত্রীর সঙ্গে এই সপ্তলোকের উল্লেখের তাৎপর্য্য এই যে—যিনি এই সপ্তলোক ব্যাপিয়া বিরাজিত, অথবা, যিনি এই সপ্তলোকরূপে নিজকে পরিণত করিয়াছেন, সেই সর্ব্বাস্তধ্যায়ী পরমেশ্বরই আমাদের বুদ্ধির প্রবর্তক এবং তাঁহার মায়াবিবর্তিকা স্বরূপ-শক্তির ধ্যানই আমরা করি। তাঁহা হইতে এই সপ্তলোক জন্মিয়াছে, তাই তিনি সবিভা—জগৎ-প্রসবিভা।

ব্যাহতি-শব্দের অর্থ—বাক্য। সৃষ্টির প্রারম্ভে সৃষ্টিকামী ব্রহ্ম ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জ্ঞঃ, তপঃ, সত্যম্—এই সাতটি শব্দের উচ্চারণ (ব্যাহরণ) করিয়াছিলেন বলিয়া এই সপ্তলোকে ব্যাহতি বলে।

এক্ষণে গায়ত্রীর শিরঃ-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। আপোজ্যোতীরসোহমৃতং ব্রহ্ম ভূভুবঃ স্বরোম্—আপঃ, জ্যোতিঃ, রসঃ, অমৃতম্, ব্রহ্ম, ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ এবং ওম্—এই নয়টি হইল গায়ত্রীর শিরঃ বা মস্তকতুল্য। এই কয়টি শব্দ সাক্ষাদভাবেই পরব্রহ্মকে বুঝায়। তাই ইহারা গায়ত্রীর উত্তমোত্তমস্থানীয়। ব্যাহতিগুলি কারণরূপ-ব্রহ্মের বাচক; অর্থাৎ সপ্তব্যাহতি পরম্পরাক্রমেই ব্রহ্মকে বুঝায়। অথবা, সপ্তব্যাহতি হইল অপর-ব্রহ্মবাচক। আর শিরঃ হইল পরব্রহ্ম-বাচক। প্রণবও পর এবং অপর উভয়-ব্রহ্মবাচক।

গায়ত্রীর শিরোবাচক শব্দগুলি কিরূপে পরব্রহ্মকে বুঝায়, তাহারই আলোচনা হইতেছে।

আপঃ—আপ-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। আপ-ধাতুর অর্থ ব্যাপ্তি। তাই, আপঃ-শব্দে ব্যাপকত্ব বুঝায়। ব্রহ্ম হইলেন সর্বব্যাপক। ইহা দ্বারা তাঁহার সর্বব্যাপক সত্ত্বাই সূচিত হইতেছে।

জ্যোতিঃ—শব্দে প্রকাশকত্ব সূচিত হয়। যেমন সূর্য—নিজেকেও প্রকাশ করে, অপরকেও প্রকাশ করে। জ্যোতিঃ-শব্দ স্বপ্রকাশত্ব বুঝাইতেছে; স্বপ্রকাশ বলিয়া চিদ্রূপত্বও বুঝায়। ব্রহ্ম হইলেন স্বপ্রকাশ, চিদেকরূপ।

রসঃ—শ্রুতির “রসো বৈ সঃ।” ব্রহ্ম রসস্বরূপ। রসয়তি আশ্বাদয়তি ইতি রসঃ—আশ্বাদক, রসিক। আর রশ্মতে আশ্বাশ্বতে ইতি রসঃ,—আশ্বাশ্ববস্ত। ব্রহ্ম হইলেন পরম-আশ্বাশ্ববস্ত এবং পরম-আশ্বাদকও।

অমৃতম্—জন্ম-জরা-মৃত্যুশূন্য। ইহা দ্বারা নিত্য-মায়ামুক্তত্ব সূচিত হইতেছে। ব্রহ্ম নিত্য-মায়ানিমুক্ত, শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত-স্বভাব।

ব্রহ্ম—বৃহত্ত্ব। সকল বিষয়ে—স্বরূপে, শক্তিতে, শক্তির কার্যে—সমস্ত বিষয়ে যিনি সর্বোপেক্ষা বৃহৎ। প্রণব বা পরব্রহ্ম সকল বিষয়ে সর্বোপেক্ষা বৃহৎ। “ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে ॥ স্বেতাস্থতর। ৬৮ ॥”

উল্লিখিত আলোচনা হইতে বুঝা গেল—পরব্রহ্ম (বা প্রণব) সর্ববিষয়ে সর্ববৃহত্তম তত্ত্ব, সর্বব্যাপক, শুদ্ধবুদ্ধনিত্যমুক্ত-স্বভাব, স্বপ্রকাশ, সৎ-চিৎ-আনন্দময়, পরম-আশ্বাশ্ব এবং পরম-আশ্বাদক।

ইহার পরেই গায়ত্রীর শিরের অপর তিনটি বস্তু—ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বঃ। ব্যাহতিতেও এই তিনটি বস্তু আছে; কিন্তু ব্যাহতির সাতটি বস্তুই প্রণবার্থের “ইদম্ বা এতৎ”—শব্দের বিবৃতি বা বাচ্য। “ইদম্ বা এতৎ”—শব্দবাচ্য বস্তুগুলি যে কালপরিণামী, একথা প্রণব-সম্বন্ধীয় শ্রুতিবাক্যে স্পষ্টরূপেই বলা হইয়াছে। স্মৃতরাং সাতটি ব্যাহতিই কালপরিণামী। গায়ত্রীর শিরঃস্থানীয় অর্থাৎ উত্তমোত্তম-স্থানীয় বস্তুগুলি কালপরিণামী হইতে পারে না। তাই, মনে হয়, শিরঃ-স্থানীয় “ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ” এই তিনটিও কালপরিণামী নয়, অর্থাৎ ব্যাহতিতে যে “ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ”—এর উল্লেখ আছে, শিরঃস্থানীয় “ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ” তাহা নয়। একার্থবোধক বা একবস্তুজ্ঞাপক শব্দ একই গায়ত্রীতে দুইবার উল্লেখের সার্থকতাও দেখা যায় না। শিরঃস্থানীয় “ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ” হইবে প্রণবের বা ব্রহ্মেরই গ্রাম্য কালাতীত। এক্ষণে, কালাতীত “ভূ, ভুবঃ, স্বঃ”—এর কি তাৎপর্য হইতে পারে, তাহাই বিবেচ্য।

প্রণবের অর্থই গায়ত্রী প্রকাশ করিয়া থাকে। প্রণবসম্বন্ধীয় শ্রুতিবাক্যগুলিতে যে কয়টি বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে, তাহা এই :—(১) ইদম্ বা এতৎ (পরিদৃশ্যমান কালপরিণামী), (২) অপরব্রহ্ম, (৩) পরব্রহ্ম (কালাতীত), (৪) প্রণবের বা ব্রহ্মের উপাসনা, (৫) উপাসনার ফল—অপরব্রহ্মপ্রাপ্তি, (৬) উপাসনার ফল পরব্রহ্মপ্রাপ্তি (৭) ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি।

গায়ত্রীতে এই সমস্ত থাকিলেই গায়ত্রীকে প্রণবের অর্থবাচক বলা সঙ্গত হইবে। এ পর্যন্ত গায়ত্রীর অর্থে উল্লিখিত বিষয়গুলির কোন্ কোন্টি পাওয়া গিয়াছে, তাহা দেখা যাউক। (১) ব্যাহতিতে “ইদম্ বা এতৎ”—এর বিবৃতি, (২) ব্যাহতিতেই অপর ব্রহ্মের বিকাশ, (৩) মূলগায়ত্রীস্থিত সবিতাদেব-শব্দে, সায়নাচার্য্যের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাষ্যানুসারে, পরব্রহ্ম এবং গায়ত্রীশিরঃস্থানীয় আপঃ, জ্যোতিঃ, রসঃ, অমৃতম্ এবং ব্রহ্ম শব্দসমূহেও পরব্রহ্ম, (৪) “ধীমহি”—শব্দে উপাসনা, (৫) উপাসনায় ব্যাহতির চিন্তায় অপরব্রহ্মের প্রাপ্তি, সায়নাচার্য্যের তৃতীয় ও চতুর্থ

প্রকারের অর্থেও অপরব্রহ্মের প্রাপ্তি, (৬) গায়ত্রীর শিরঃস্থানীয় আপঃ, জ্যোতিঃ, রসঃ, অমৃতম্ এবং ব্রহ্মের চিন্তাগর্ভ উপাসনায় পরব্রহ্মপ্রাপ্তি—এই কয়টি বিষয় পাওয়া গিয়াছে। গায়ত্রীর যে অর্থ এপর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে “ব্রহ্মলোক” সম্বন্ধে কোনও কথা পাওয়া যায় নাই। তাহাতে মনে হয়, পূর্ণ গায়ত্রীর অবশিষ্ট অংশের—শিরঃস্থানীয় “ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ”—এই অংশের—ব্যাখ্যায় সম্ভবতঃ “ব্রহ্মলোকই” বিবৃত হইয়াছে।

ভূঃ এবং ভুবঃ—এই উভয় শব্দই ভূ-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ভূ-ধাতুতে সত্তা বুঝায়। সুতরাং এই উভয় শব্দই স্থানবাচক—লোক-বাচক হইতে পারে। অভিধানে দেখা যায়, ভূ-শব্দে স্থানমাত্রকেই বুঝায় (মেদিনী)। সুতরাং এস্থলেও ভূ-শব্দে স্থানবিশেষ বা লোকবিশেষকে বুঝাইতে পারে এবং ভূ-শব্দ গায়ত্রীর শিরঃস্থানীয় বলিয়া এই স্থান হইবে কালাতীত স্থান—কালাতীত ব্রহ্মের ধাম-বিশেষ।

প্রণবের উপাসনাবাচক শ্রুতিবাক্যে, “ব্রহ্মলোকে মহীয়ান্” হওয়াকে সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসনার ফল বলা হইয়াছে। সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসনার ফলও সর্বশ্রেষ্ঠ—কালাতীত কোনও নিত্যবস্তুই হইবে। সুতরাং ব্রহ্মলোক যে কালাতীত নিত্যবস্তু, তাহাই বুঝা গেল। মুণ্ডক-শ্রুতিতেও ব্রহ্মের ধামের কথা পাওয়া যায়। “সঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্ যশ্চ এষ মহিমা ভূবি দিবে ব্রহ্মপুরে হেব বোম্মাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ২।২।৭॥” ঋকপরিশিষ্টেও বিষ্ণুলোকের কথা দৃষ্ট হয়। “যত্র তৎপরমং পদং বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥” অনুত্রও এইরূপ শ্রুতিবাক্য দৃষ্ট হয়। “স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি। সে মহিম্নি ইতি ॥” ছাঃ উঃ ৭।২৪।১ ॥” ব্রহ্মের এই “স্বীয়-মহিমা” তাঁহার স্বরূপ-শক্তি ব্যতীত অপর কিছুই নহে। সুতরাং ব্রহ্মের স্বরূপশক্তির বিলাসবিশেষই তাঁহার ধাম বা লোক; তাই ব্রহ্মলোক হইবে—নিত্য, লোকাতীত। কারণ, ইহা লোকাতীত ব্রহ্মের ধাম।

এক্ষণে বুঝা গেল, গায়ত্রী-শিরঃস্থানীয় ভূঃ-শব্দে কালাতীত নিত্য ব্রহ্মলোকই বুঝাইতেছে।

ভুবঃ-শব্দের আভিধানিক অর্থ আকাশও হয় (শব্দকল্পদ্রুম); আকাশে ব্যাপ্তি বুঝায়। সুতরাং ভুবঃ-শব্দে ব্যাপকত্ব সূচিত হইতেছে। ব্রহ্মলোক সর্বব্যাপক—ইহাই তাৎপর্য। অথবা, ভূ-ধাতুর প্রকাশন অর্থও হইতে পারে। “ভুবঃ ইতি সর্বং ভাবয়তি প্রকাশয়তি ইতি ব্যুৎপত্ত্যা চিদ্রূপমুচ্যতে (শঙ্করাচার্য্য)—সমস্তকে প্রকাশ করে, এই ব্যুৎপত্তিবশতঃ ভুবঃ-শব্দে চিদ্রূপতা বুঝাইতেছে।” এই অর্থে ভুবঃ-শব্দে স্বপ্রকাশতা এবং চিদ্রূপতা বুঝাইতেছে। ব্রহ্মলোক হইল স্বপ্রকাশ এবং চিদ্রূপ—সুতরাং কালাতীত।

তারপর “স্বঃ”-শব্দের তাৎপর্য। শ্রীমদ্ভাগবতের “নায়ং শ্রিয়োহঙ্গ উ নিতাস্তরতে: প্রসাদঃ স্বর্ধোষিতাম্”—ইত্যাদি ১০।৪৭।৬০-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী “স্বর্ধোষিতাম্-শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—“দিব্যসুখ-ভোগাম্পদ-লোকগণশিরোমণিবৈকুণ্ঠস্থিতানাং যোষিতাম্।” তিনি “স্বঃ”-শব্দের অর্থ করিলেন—দিব্যসুখভোগাম্পদ বৈকুণ্ঠ বা ভগবদ্ধাম। এই ভগবদ্ধাম বা ব্রহ্মলোক হইল দিব্যসুখভোগাম্পদ—দিব্যসুখ বলিতে কালাতীত নিত্য চিন্ময় সুখকেই বুঝায়। মূল গায়ত্রীতে যাহাকে “সবিতুঃ দেবশ্চ” বলা হইয়াছে, সেই দেবের ধাম দিব্যসুখময়ই হইবে। এইরূপে দেখা গেল “স্বঃ”-শব্দে চিন্ময়-সুখস্বরূপ সূচিত হইতেছে। ব্রহ্মলোক হইল চিন্ময়সুখস্বরূপ।

অথবা, স্বঃ-শব্দে দিব্যসুখময় ব্রহ্মধাম, ভূঃ-শব্দে তাহার নিত্যত্ব এবং ভুবঃ-শব্দে তাহার স্বপ্রকাশত্ব এবং চিন্ময়ত্ব সূচিত হইতেছে—এইরূপ অর্থও হইতে পারে।

এইরূপে দেখা গেল—গায়ত্রী শিরঃস্থানীয় “ভূঃ ভুবঃ স্বঃ”—অংশে দিব্যসুখস্বরূপ, স্বপ্রকাশ, চিদ্রূপ এবং সর্বব্যাপক ব্রহ্মলোক সূচিত হইতেছে।

সর্বশেষ “ওম্”-শব্দে সূচিত হইতেছে যে, গায়ত্রীর অর্থে—ব্যাহতি এবং শিরোযুক্ত গায়ত্রীর অর্থে—যাহা যাহা বলা হইল, তৎসমস্তই “ওম্” বা প্রণব এবং প্রণবেরই বিভূতি।

গায়ত্রীর সম্পূর্ণ অর্থ বিবৃত হইল। এই অর্থ হইতে দেখা যায়, প্রণবের অর্থ গায়ত্রীতে কিঞ্চিং পরিস্ফুট হইয়াছে। “ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ”—অংশের ব্যাখ্যায় উপক্রমে তাহার ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি,

প্রণবের অর্থে বীজাকারে সম্বন্ধতত্ত্ব, অভিধেয়তত্ত্ব এবং প্রয়োজনতত্ত্বের কথাও আছে। গায়ত্রীতেও এসকল কথা একটু স্ফুটতর ভাবে বিদ্যমান, তাহাই এক্ষণে দেখান হইতেছে।

গায়ত্রীতে সম্বন্ধ-তত্ত্ব। (ক) প্রণবে যাহা কেবল “ইদম্ বা এতৎ” এবং “ভূতম ভবং—ভবিষ্যৎ” ইত্যাদি বাক্যে ইঙ্গিতে মাত্র উল্লিখিত হইয়াছে, গায়ত্রীর ব্যাহতিতে তাহাকে স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে—ভূভুবাদি সপ্তলোকই প্রণবার্থের ইদম্-শব্দের বাচ্য।

(খ) প্রণবের অর্থে যাহা কেবল “যচ্চ অচ্চং ত্রিকালাতীতম্”—বাক্যে ইঙ্গিতে উল্লিখিত হইয়াছে, গায়ত্রীর শিরে তাহাই একটু স্পষ্টীকৃত হইয়াছে—আপঃ, জ্যোতিঃ, রসঃ, অমৃতম্, ব্রহ্ম—এই পদসমূহে। প্রণব বা ব্রহ্ম সর্বব্যাপক, স্বপ্রকাশ, চিদেকরূপ, পরম-আস্বাদ্য, পরম-আস্বাদক, শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব—অজ্বর, অপহতপাপা ইত্যাদি, স্বরূপে, শক্তিতে, শক্তির কার্যে—সর্ববিষয়ে সর্ববৃহত্তম তত্ত্ব।

(গ) প্রণব বা ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ সর্ববিং সর্বেশ্বর এবং অন্তর্যামী বলিয়া এবং জগতের যোনি ও সৃষ্টিকর্তা বলিয়া আমাদের—জগতিস্থ জীবের—বুদ্ধির প্রেরক, আমাদের কর্মবিষয়া বুদ্ধি এবং ধর্মবিষয়া বুদ্ধির প্রবর্তক, অর্থাৎ আমাদের পুরুষার্থ-বিষয়ক প্রয়াসে আমাদের বুদ্ধির বা ইচ্ছার প্রবর্তক।

গায়ত্রীতে অভিধেয়তত্ত্ব। (ঘ) প্রণবের অর্থে উপাসনার বা ধ্যানের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রণবের কোন বৈশিষ্ট্যের উপাসনা বা ধ্যান করিতে হইবে, তাহা বলা হয় নাই। গায়ত্রীতে তাহা বলা হইয়াছে—তাঁহার ভর্গের বা তেজের (স্বরূপশক্তির) ধ্যান করিতে হইবে; যেহেতু, এই তেজ সকলের উপাস্ত, সকলের জ্ঞেয়, সম্যকরূপে সকলের ভজনীয়। কেন এই তেজ সকলের সম্যকরূপে ভজনীয়, তাহাও বলা হইয়াছে—এই তেজ স্বয়ংজ্যোতি এবং ব্রহ্মায়ক বলিয়া ইহা দ্বারা মায়ী এবং মায়ার কার্য ভর্জিত বা নিবীৰ্য্য হয়—সম্যকরূপে দূরীভূত হয়।

(ঙ) সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি, সর্বকারণকারণ, রসস্বরূপ প্রণব বা ব্রহ্মের তেজের ধ্যানের কথা বলাতে ইহাও সূচিত হইতেছে যে, গায়ত্রীর ব্যাহতিস্থানীয় ভূভুবাদি সপ্তলোক—প্রণবের অভিব্যক্তি হইলেও—সুতরাং অপরব্রহ্ম হইলেও—অবিজ্ঞা ও অবিজ্ঞার প্রভাব হইতে মোক্ষাকাজক্ষী পুরুষের পক্ষে ধ্যেয় নয়; তাঁহার পক্ষে প্রণবের তেজই ধ্যেয়। যাহারা অপর ব্রহ্ম প্রাপ্তির—অর্থাৎ ভূভুবাদিলোকের অনিত্য সুখভোগ প্রাপ্তির—আকাজক্ষা করেন, তাঁহারা ঐসমস্ত সুখভোগের কামনা চিন্তে পোষণ করিয়া প্রণবের তেজের ধ্যান করিলে তাহা পাইতে পারেন। যাহারা অবিজ্ঞা হইতে উদ্ধার লাভ পূর্বক পরব্রহ্ম প্রাপ্তির কামনা করিবেন, ব্রহ্মকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাঁহার তেজের ধ্যানই তাঁহাদের কর্তব্য। প্রণবার্থে কঠোপনিষদের “যো যদ ইচ্ছতি তস্ত তৎ”—এই বাক্য হইতেই সাধকের ইচ্ছানুরূপ প্রাপ্তির কথা আসিতেছে।

গায়ত্রীতে প্রয়োজনতত্ত্ব। (চ) গায়ত্রীর অর্থ হইতে জানা যায়, অবিজ্ঞার এবং অবিজ্ঞার প্রভাবের সম্যক অপসারণই ব্রহ্মের তেজের ধ্যানের মুখ্য ফল। ইহা হইতে বুঝা যায়, এই অবিজ্ঞার প্রভাবেই জগতিস্থ জীব কালের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতেছে এবং ব্রহ্মের সহিত তাহার সম্বন্ধের কথা ভুলিয়া আছে। সুতরাং অবিজ্ঞা অপসারিত হইলেই জীব কালের প্রভাবের বাহিরে যাইতে পারিবে, পরিদৃষ্টমান্ জগতে পুনঃ পুনঃ গতাগতি হইতে রক্ষা পাইতে পারিবে; তখনই তাহার সম্বন্ধের জ্ঞান স্ফুরিত হইবে, তখনই জীব “ব্রহ্মলোকে মহীয়ান্” হইতে পারিবে।

(ছ) ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধটা যখন নিত্য এবং অবিচ্ছেদ্য, যে আবরণে তাহা আবৃত হইয়া আছে, তাহা (অর্থাৎ অবিজ্ঞা) অপসারিত হইলে সম্বন্ধের জ্ঞান আপনা-আপনিই স্ফুরিত হইতে পারে, সম্বন্ধের জ্ঞান স্ফুরিত হইলেই জীব “ব্রহ্মলোকে মহীয়ান্” হইতে পারে। ইহাই উপাসনার ফল বা প্রয়োজনতত্ত্ব।

এইরূপে দেখা গেল, প্রণবে যাহা বলা হইয়াছে, গায়ত্রীতে তাহাই স্ফুটতর ভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে। প্রণবকে বীজ মনে করিলে গায়ত্রীকে তাহার অন্তর মনে করা যায়; বস্তুতঃ বেদ-উপনিষদাদি সমস্ত শাস্ত্রই

প্রণবের এবং গায়ত্রীর অর্থপ্রকাশক। বীজরূপ প্রণবই গায়ত্রীতে অঙ্কুরিত হইয়া বেদ-উপনিষদাদিরূপ বিরাট মহীকূহে পরিণতি লাভ করিয়াছে।

গীতায় প্রণবের অর্থ-বিকাশ। মহাভারতের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে প্রণবের বা গায়ত্রীর অর্থ আরও একটু পরিষ্কৃত হইয়াছে। গীতাসম্বন্ধে বলা হইয়াছে—“সর্বোপনিষদো গাবো দোন্ধা গোপালনন্দনঃ। পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুষ্কঃ গীতামৃতঃ মহৎ ॥—সমস্ত উপনিষদ-রাশি গাভীসদৃশ; পার্থ বৎসসদৃশ; আর গোপরাজনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গাভীদোহনকারী। বৎসরূপ অর্জুনের উপলক্ষে তিনি গীতামূত্ররূপ দুগ্ধ দোহন করিয়াছেন। নির্মলবুদ্ধি ব্যক্তিগণ এই দুগ্ধের ভোক্তা।” এই উক্তি হইতে জানা যায়—সমস্ত উপনিষদের সার হইল শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। সুতরাং গীতার উক্তি হইল উপনিষদেরই উক্তি। গীতায় প্রণব বা গায়ত্রীর অর্থ কিরূপ বিকাশ লাভ করিয়াছে; দেখা যাউক।

(ক) গীতা হইতে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণই প্রণব এবং শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম, সমস্তের আদি, অজ, শাস্বত, বিভূ। শ্রীকৃষ্ণোক্তি যথা। পিতাহমশ্চ জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ। বেতং পবিত্রমোক্ষারঃ ঋকৃ সাম যজুর্বেদ চ ॥ ৯।১৭ ॥ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জুনোক্তি, যথা। “পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্। পুরুষঃ শাস্বতং দিব্যানাদিদেবমজং বিভূম্ ॥ ১০।১২ ॥” প্রণবের অর্থেও বলা হইয়াছে—প্রণবই ব্রহ্ম।

(খ) প্রণবের অর্থে বলা হইয়াছে, প্রণব বা ব্রহ্মই জগতের যোনি,—উৎপত্তি ও প্রলয়ের হেতু। গীতা বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণই জগতের যোনি। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন—“অহং কৃৎসন্ত জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৭।৬ ॥ বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্ ॥ ৭।১০ ॥ অহং সর্বস্ত প্রভবো মন্তঃ সর্বং প্রবর্ততে ॥ ১০।৮ ॥”

(গ) প্রণবের অর্থে ইঙ্গিতে জানা গিয়াছিল, প্রণব বা ব্রহ্মই জগতের অধিষ্ঠান; গীতায় স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণই জগতের অধিষ্ঠান। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন—“ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭।৭ ॥” বিশ্বরূপে অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ তাহা দেখাইয়াছেনও।

(ঘ) জগতের অধিষ্ঠানভূত হইয়াও জগতের সহিত যে প্রণবের বা ব্রহ্মের স্পর্শ নাই, প্রণবের অর্থে প্রচ্ছন্নভাবে তাহা জানা গিয়াছে। গীতা স্পষ্ট কথায় বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ জগতের অধিষ্ঠান হইয়াও স্পর্শহীন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন—“যে চৈব সাত্বিকাত্মা বা রাজসাত্ত্বমস্যাচ যে। মন্ত এবৈতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥ ৭।১২ ॥—সাত্বিক, রাজস ও তামস যত প্রকার পদার্থ আছে, তৎসমস্ত আমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। তাহারা আমাতে আছে, আমি কিন্তু তাহাদের মধ্যে নাই।”

এইরূপে জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্ম, শ্রীকৃষ্ণই প্রণব।

(ঙ) প্রণবের বা গায়ত্রীর অর্থে যাহা পরিষ্কৃত হয় নাই, পরব্রহ্মের রূপ-গুণ-লীলাদি সম্বন্ধে সেইরূপ কথাও গীতায় জানা যায়। “জন্ম কৰ্ম চ মে দিব্যম্ ॥ ৪।৯ ॥”—ইত্যাদি বাক্যে অর্জুনের নিকট পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—তাহার আবির্ভাব-তিরোভাব (দিব্যজন্ম) আছে, তাহার লীলা (কৰ্ম) আছে। জগতের কল্যাণের নিমিত্ত তিনি জগতে অবতীর্ণ হন। “যদা যদাহি ধৰ্ম্মস্ত গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধৰ্ম্মস্ত তদাত্মনং স্বজাম্যহম্ ॥ পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধৰ্ম্মসংস্থাপনার্থায় সংভবামি যুগে যুগে ॥ ৪।৭-৮ ॥” তাহার যে অনন্ত রূপ আছে, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ তাহাও অর্জুনের নিকটে বলিয়াছেন এবং অর্জুনকে কোনও কোনও রূপ দেখাইয়াছেনও। “পশু মে পার্থ রূপাণি শতশোহথ সহস্রশঃ। নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥ ১১।৫ ॥”

(চ) প্রণবের অর্থে প্রণব বা ব্রহ্মকে অন্তর্যামী বলা হইয়াছে। অন্তর্যামী বলিয়া গায়ত্রীতে তাঁহাকে বুদ্ধির প্রবর্তক এবং ধ্যেয় বলা হইয়াছে। এসম্বন্ধে গীতার উক্তি বেশ সুস্পষ্ট। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের নিকট বলিয়াছেন—“সর্বস্ত চাহং হৃদি সম্মিষিষ্টো মন্তঃ স্মৃতিজ্ঞানমপোহনঞ্চ। বেদৈশ্চ সর্কৈরহমেব বেত্তো বেদান্তকৃৎসদবিদেব চাহম্ ॥ ১৫।১৫ ॥—অন্তর্যামিরূপে সকলের হৃদয়ে আমিই প্রবিষ্ট হইয়া আছি। আমা হইতেই তাহাদের পূর্বানুভূত বিষয়ের

স্মৃতি জন্মে, আমি হইতেই তাহাদের বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগজ জ্ঞান জন্মে এবং আমি হইতেই তাহাদের স্মৃতি ও জ্ঞানের অভাব হয়। আমিই সকল বেদের বেত্ত। বেদান্তার্থের প্রবর্তকও আমি, বেদের প্রকৃত অর্থবেত্তাও আমি।”

অন্যত্রও এরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। “ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদেঃশেহর্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্তাকৃঢ়াণি মায়ায়া ॥ ১৮।৬১ ॥—শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন—ঈশ্বর (প্রণব-রূপ সর্বৈশ্বর) অন্তর্যামিরূপে প্রাণিসমূহের হৃদয়ে বাস করিয়া স্বীয় শক্তিদ্বারা যন্তাকৃঢ় পুতলিকার গায় তাহাদিগকে ভ্রমণ করাইতেছেন—বিবিধ কৰ্ম্মে প্রবর্তিত করিতেছেন।” ঐতিও এরূপ বলিয়া থাকেন। “একো দেবঃ সর্বভূতেষু গৃঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরায়া। কৰ্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাবিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নিগুণশ্চ ॥ শ্বেতাস্বতর। ৬।১১ ॥ য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মানমন্তরো যময়তি যমাত্মা ন বেদ যন্তাত্মা শরীরমেব ত আত্মাহন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ বৃহদারণ্যক। ৩।৭।৩ ॥”

ধৰ্ম্মানুষ্ঠানাদি-বিষয়ে বুদ্ধির প্রবর্তকও তিনি। “তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে ॥ গীতা। ১০।১০ ॥—শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের নিকটে বলিতেছেন—যাহারা প্রীতিপূর্বক সর্বদা ঐকান্তিক ভাবে আমার ভজন করেন, আমি তাঁহাদিগকে সেইরূপ বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যদ্বারা তাঁহারা আমাকে পাইতে পারেন।”

এইরূপে গীতাতে প্রণবের যে অর্থ বিকশিত হইয়াছে, তদনুসারে জানা যায়—শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম, শ্রীকৃষ্ণই প্রণব, শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত বেদের প্রতিপাদ্য এবং শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত তত্ত্ব।

গীতায় অভিধেয়তত্ত্ব। (ছ) প্রণবের অর্থে প্রণবকে বা ব্রহ্মকে জানার উপদেশ এবং তদনুকূল সাধনের উপদেশও আছে। গায়ত্রীর অর্থেও তাঁহার তেজের ধ্যানের কথা দৃষ্ট হয়। সেই ধ্যানের তাৎপর্য্য কি, কোন্ উপায়ে পরব্রহ্মকে জানা যায়, গীতা অতি স্পষ্ট ভাবে তাহা বলিয়া গিয়াছেন। অর্জুনের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—ভক্তিদ্বারাই তাঁহাকে জানা যাইতে পারে। “ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চামি তত্ত্বতঃ। ১৮।৫৫ ॥—শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন, আমি স্বরূপতঃ যেরূপ (সর্বব্যাপী) এবং স্বরূপতঃ আমি যাহা (সচ্চিদানন্দ), ভক্তিদ্বারাই তাহা সম্যকরূপে জানা যায়।” আরও তিনি বলিয়াছেন—“ভক্ত্যা স্বনগ্নয়া শক্যো হৃহমেবংবিধোহর্জুন। জাতুং ব্রহ্মং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরম্পর ॥ ১১।৫৪ ॥—অনন্তভক্তিদ্বারাই আমার এই তত্ত্ব জানিতে, আমার স্বরূপ দর্শন করিতে এবং আমাতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হওয়া যায়।”

গায়ত্রীর অর্থে যে ধ্যানের কথা বলা হইয়াছে, গীতার বাক্য হইতে জানা গেল, তাহা হইবে ভক্তিমূলক ধ্যান। ভক্তিদ্বারাই তাঁহাকে জানা যায় (অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধের জ্ঞান জন্মিতে পারে), ভক্তিদ্বারাই তাঁহার দর্শন লাভ হইতে পারে এবং ভক্তির সাহায্যেই তাঁহাতে প্রবেশ লাভ (অর্থাৎ সাযুজ্যমুক্তি) হইতে পারে। এইরূপে ভক্তির অভিধেয়ত্বই গীতায় প্রতিপন্ন হইল।

গীতায় প্রয়োজনতত্ত্ব। (জ) উপাসনার ফলে যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই পাইতে পারেন—প্রণবের অর্থে তাহা জানা গিয়াছে। কিন্তু বিভিন্ন প্রাপ্তব্য বস্তুর স্বরূপ কি, তাহা প্রণবের বা গায়ত্রীর অর্থে জানা যায় নাই; কেবল পরব্রহ্মের এবং অপর-ব্রহ্মের প্রাপ্তি—ইহারই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছিল। এসম্বন্ধে গীতায় স্পষ্টতর উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

কৰ্ম্মের অনুষ্ঠানে স্বর্গাদিসুখভোগ লাভ হইতে পারে; কিন্তু এই স্বর্গসুখ যে অনিত্য, তাহাও গীতায় বলা হইয়াছে। ইহা অপরব্রহ্ম প্রাপ্তি।

পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যোগের কথা, ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্যের কথা এবং শ্রীকৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তির (ব্রহ্মলোকে মহীয়ান হওয়ার) কথাও গীতায় বলা হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তির কথাই গীতার শেষ কথা (১৮।৬৫)। এবং ইহা যে সর্বগুহ্যতম পরম-বাক্য, তাহাও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন (১৮।৬৪)। ইহাতে বুঝা যায়, সেবাপ্রাপ্তিই চরম-তম কাম্যবস্তু। ইহাই চরম-তম প্রয়োজন।

মন্তব্য। (ঝ) গীতা হইতে জানা গেল, শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম, শ্রীকৃষ্ণই প্রণব।

(এ) প্রণবের অর্থে সাধনের উপদেশ আছে। কেন সাধনের প্রয়োজন হইল, তাহা বলা হয় নাই। তাহা প্রচ্ছন্ন আছে। গায়ত্রীর ভগ্ন-শব্দের অর্থে সাধনাচার্য্য একটু ইঙ্গিত দিয়াছেন—অবিচারকে অপসারিত করাইবার জগুই ব্রহ্মের তেজের ধ্যান করিতে হয়। এই অবিচার বা মায়ায় কথা গায়ত্রীতেও স্পষ্ট নহে। গীতায় একটু স্পষ্ট উল্লেখ দৃষ্ট হয়। “ত্রিভিগুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ। মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥ ৭।১৩ ॥—শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের নিকটে বলিতেছেন, মায়ায় ত্রিবিধ গুণময় ভাবই (অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা মায়াই) জগৎকে (অর্থাৎ জগদ্বাসী জীবগণকে) মোহিত করিয়া রাখিয়াছে। মায়ায়-গুণসমূহের অতীত অব্যয় (নির্বিকার) আমাকে মুগ্ধজীব জানিতে পারে না।” জীব মায়াদ্বারা মুগ্ধ হইয়া আছে বলিয়াই পরব্রহ্মকে (সুতরাং পরব্রহ্মের সহিত জীবের সম্বন্ধকেও) ভুলিয়া আছে। তাই, এই ভুল দূর করার জন্ত সাধনের প্রয়োজন হয়।

(ট) মায়ায় প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারিলেই জীব ব্রহ্মকে জানিতে পারে, জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধের জ্ঞানও স্মরিত হইতে পারে। কিরূপে, অর্থাৎ কিরূপ সাধনে, মায়ায় প্রভাব হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, তাহাও পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন। “দৈবীহেমা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যা। মামেব যে প্রপণন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ৭।১৪ ॥—এই গুণময়ী মায়া আমার শক্তি; তাই জীবের পক্ষে দুর্লভজনীয়া। যাহারা আমার শরণাপন্ন হয়, কেবলমাত্র তাহারাই মায়ায় কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে।” তাঁহার শরণাপন্ন হওয়ার তাৎপর্য্য হইতেছে—ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার ভজন করা। পূর্ব্বোল্লিখিত “ভক্ত্যা মামভিজানাতি”—ইত্যাদি বাক্যে তাহাই প্রকাশ করা হইয়াছে। গায়ত্রীর ভাষ্যে “ভগ্ন-শব্দের অর্থে সাধনাচার্য্য যাহা বলিয়াছেন, গীতার উল্লিখিত “দৈবীহেমা”—ইত্যাদি শ্লোকে তাহার সমর্থন পাওয়া যায়। মায়া যে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের শক্তি, তাহাও জানা গেল।

(ঠ) প্রণবের অর্থে বলা হইয়াছে, ব্রহ্মই এই পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং এই পরিদৃশ্যমান জগতের অতীতও অণু কিছু আছে, যাহা ত্রিকালাতীত—তাহাও ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম। উপরোক্ত (এ)-অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত (৭।১৩) গীতা-শ্লোকের অন্তর্গত “এভ্যঃ পরমব্যয়ম্”—বাক্যে যেই কালাতীত ব্রহ্মের পরিচয় পাওয়া যায়—তিনি শ্রীকৃষ্ণ। গায়ত্রীর শিরঃ-অংশে “আপঃ, জ্যোতিঃ, রসঃ, অমৃতম্ এবং ব্রহ্ম”—এই শব্দসমূহও এই কালাতীত ব্রহ্মের কথাই বলা হইয়াছে; তবে তিনি যে শ্রীকৃষ্ণ, তাহা গীতার শ্লোকে স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। গোপালতাপনী-শ্রুতিতেও এইরূপ স্পষ্টোক্তি দৃষ্ট হয়।

(ড) ব্রহ্মকর্তৃক সৃষ্ট বলিয়া জীবের সহিত তাঁহার একটা নিত্য সম্বন্ধের ইঙ্গিত প্রণবের অর্থে পাওয়া যায়। প্রণবের অর্থে এবং গায়ত্রীতে উপাসনার উপদেশেও সেই সম্বন্ধের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কিন্তু সেই সম্বন্ধটী কিরূপ, প্রণবের বা গায়ত্রীর অর্থে তাহা জানা যায় না। গীতাতে তাহা জানা যায়। “অপরেয়মিতত্ত্বাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীভূতাং মহাবাহো”—ইত্যাদি (৭।৫)-শ্লোকে বলা হইয়াছে—জীব পরমপতঃ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের শক্তি—জীভূতা-শক্তি বা জীবশক্তি এবং এই শক্তি তাঁহার মায়াশক্তি হইতে উৎকৃষ্ট। আবার “মমৈবাংশো জীভূতো”—ইত্যাদি (১৫।৭)-শ্লোকে বলা হইয়াছে—জীব পরমপতঃ তাঁহার অংশ। আবার “অচ্ছেদ্যোহয়মদাহোহয়মক্রেদ্যোহশোষ্য এব চ।”—ইত্যাদি (২।২৪)-শ্লোক হইতে জানা যায়, জীব পরমপতঃ অড়-বিরোধী—চিন্ময় বস্তু। এজগুই জীবশক্তিকে মায়াশক্তি হইতে শ্রেষ্ঠা বলা হইয়াছে।

(ঢ) জীব পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের শক্তি এবং অংশ হওয়ায় ইহাও জানা যাইতেছে যে, জীব পরমপতঃ পরব্রহ্ম-শ্রীকৃষ্ণেরই দাস। কারণ, শক্তিমানের সেবাই শক্তির পরমাপেক্ষাধীন ধর্ম্ম এবং অংশীর সেবা করাই অংশেরও স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এজগুই শ্রীকৃষ্ণসেবাকে “সর্বগুহ্যতম পরম-বাক্য” বলা হইয়াছে।

(ণ) প্রণবের অর্থে যে “ব্রহ্মলোকের” উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে এবং গায়ত্রীর শিরোভাগে “ভূভুবঃ স্বঃ”—অংশে যাহার স্বরূপের ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছে, গীতাতেও “যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৮।২১ ॥” এবং “যদগস্ত্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ১৫।৬ ॥—যেস্থানে গেলে আর এই সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না।”—এই বাক্যদ্বয়ে তাহারই কথা দৃষ্ট হয়।

(ত) প্রণবের অর্থে ব্রহ্মকে সবিশেষ বলা হইয়াছে। সবিশেষ হইলে তাঁহার শক্তিও থাকিবে। গায়ত্রীর “ভর্গ”-শব্দে এই শক্তিরই পরিচয় পাওয়া যায়। এই শক্তিরই আরও এক বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে গীতার “ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহম্—আমি ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা। ১৪।২৭ ॥”-বাক্যে। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—তিনি ব্রহ্মের আশ্রয়। মুণ্ডক-শ্রুতিতেও অনুরূপ উক্তি পাওয়া যায়। “সদা পশুঃ পশুতে কল্পবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্ ॥ ৩।১।৩ ॥”—এই শ্রুতিবাক্যে “কর্তা, ঈশ্বর, পুরুষকে”—প্রণবের অর্থে যাহাকে “সর্বৈশ্বর্য”-বলা হইয়াছে, তাঁহাকে “ব্রহ্মের যোনি” বা “ব্রহ্মের মূল” বলা হইয়াছে। “একোহপি সন্ যো বহুধাবভাতি ॥”-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে জানা যায়, পরব্রহ্ম এক হইয়াও বহু রূপে প্রতিভাত হন। তাঁহার শক্তির প্রভাবেই ইহা সম্ভব। গীতায় পরব্রহ্ম-শ্রীকৃষ্ণকে যে-ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় বলা হইয়াছে, সেই ব্রহ্মও এই পরব্রহ্ম-শ্রীকৃষ্ণেরই এক রূপ—একথাই যেন প্রকাশ পাইতেছে। শক্তির অস্তিত্ব হইতেও জানা যায়—ব্রহ্ম বা প্রণব সবিশেষ।

(থ) গীতায় পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের দুইটি শক্তির স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া গেল—জীবশক্তি এবং মায়াশক্তি। তাৎপর্যার্থে স্বরূপ-শক্তির উল্লেখও দৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণের দিব্য-জ্ঞান-কর্মাদি, বিশ্বরূপ-প্রকটনাদি, মায়াদূরীকরণ-সামর্থ্যাদি তাঁহার স্বরূপ-শক্তির পরিচায়ক।

এইরূপে দেখা গেল, যে অর্থ প্রণবে বীজরূপে এবং গায়ত্রীতে অক্ষররূপে দৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাই গীতাতে পরিপুষ্ট অক্ষররূপে—শাখাপত্রাদিসমন্বিতরূপে—অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে।

চতুঃশ্লোকীতে প্রণবের অর্থবিকাশ। সৃষ্টি-আরম্ভের পূর্বে—কিরূপে সৃষ্টি করা হইবে—এবিষয় চিন্তা করিতে করিতে ব্রহ্মার সুদীর্ঘকাল অতীত হইল; তথাপি তিনি কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কিন্তু তিনি চিন্তা হইতে বিরত হইলেন না। তখন, তপস্বী করার জন্ত এক আকাশবাণী তাঁহাকে আদেশ দিলে, তিনি জ্ঞানেন্দ্রিয়-কর্মেন্দ্রিয়াদি সংযত করিয়া দেবপরিমিত সহস্র বৎসর পর্যন্ত তপস্বী করিলেন। তাঁহার তপস্ব্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাকে বৈকুণ্ঠলোক দর্শন করাইলেন। সপার্বদ শ্রীভগবানকে দর্শন করিয়া ব্রহ্মার দেহে অশ্রু-কম্প-পুলকাদির উদয় হইল, তিনি ভগবানের চরণে প্রণত হইলেন। ভগবান্ স্বীয় করে তাঁহার করস্পর্শ করিয়া, তাঁহার তপস্ব্যায় সন্তুষ্ট হইয়াছেন জানাইয়া, তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলে ব্রহ্মা চারিটি বিষয় জানিতে চাহিলেন, যথা “(১) আপনার স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপ কীদৃশ, (২) আপনার মায়া কি বস্তু, (৩) মায়ার সহযোগে আপনার লীলাতত্ত্ব কিরূপ এবং (৪) কি উপায় অবলম্বন করিলে এসমস্ত তত্ত্বের জ্ঞান জন্মিতে পারে এবং মায়াভিভূতও হইতে হইবে না।” ভগবান্ প্রীত হইয়া চারিটি শ্লোকে কয়েকটি তত্ত্বকথা ব্রহ্মাকে উপদেশ করিয়া বলিলেন—“এই উপদেশগুলির কথা একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিলে কল্প-বিকল্পেও তোমার আর মোহ জন্মিবে না।” ব্রহ্মার প্রতি শ্রীভগবানের উপদিষ্ট এই চারিটি শ্লোককেই চতুঃশ্লোকী বলে। এই চারিটি শ্লোক ব্রহ্মা স্বীয় পুত্র নারদকে একটু বিস্তৃতভাবে উপদেশ করেন (শ্রীভা, ২।৭।৪১ এবং ২।৯।৪৩) এবং নারদ আবার সরস্বতী-নদীতীরে স্বীয় আশ্রমে ধ্যাননিমগ্ন ব্যাসদেবের নিকটে তাহা কীর্তন করেন (শ্রীভা, ২।৯।৪৪)। শুনিয়া ব্যাসদেব মনে করিলেন—“এই অর্থ আমার সূত্রের ব্যাখ্যারূপ। শ্রীভাগবত করি সূত্রের ভাষ্যরূপ ॥ ২।২৫।৮১ ॥”

বিভিন্ন উপনিষদের সমন্বয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে ব্যাসদেব বেদান্ত-সূত্র গ্রন্থিত করিয়াছিলেন। চতুঃশ্লোকী দেখিয়া তিনি মনে করিলেন—বেদান্ত-সূত্রে তিনি যাহা প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছিলেন, এই চতুঃশ্লোকীর প্রতিপাত্যও তাহাই। এই চতুঃশ্লোকীকে বিবৃত করিয়া তখন তিনি শ্রীমদ্ভাগবত প্রকটিত করিলেন। “অতএব সূত্রের ভাষ্য শ্রীভাগবত ॥ ২।২৫।৮৪ ॥” শ্রীমদ্ভাগবত বেদান্তসূত্রকার-ব্যাসদেবকৃত বেদান্তসূত্রের ভাষ্য স্বরূপ। “অতএব ভাগবত—সূত্রের অর্থরূপ। নিজকৃত সূত্রের নিজ ভাষ্যস্বরূপ ॥ ২।২৫।১০৮ ॥” শ্রীমদ্ভাগবত গায়ত্রীরও ভাষ্যসদৃশ। শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে তাই গরুড়পুরাণ বলেন “অর্থোহয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ-বিনির্ঘয়ঃ। গায়ত্রীভাষ্যরূপোহসৌ বেদার্থ-পরিবৃংহিতঃ। পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ ভগবতোদিতঃ। দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোহয়ং শতবিচ্ছেদসংযুতঃ। গ্রন্থোহষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ ॥—শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ সয়ংভগবান্ কর্তৃক কথিত। ইহাতে দ্বাদশটি স্কন্ধ এবং শত শত (তিনশত

পর্যব্রজী) অধ্যায় আছে। ইহা ব্রহ্মসূত্রের অর্থসদৃশ, ইহাতে সমগ্র মহাভারতের অর্থ-নির্ণীত হইয়াছে, ইহা গায়ত্রীর ভাষ্কর্যরূপ, সমগ্র বেদার্থ-দ্বারা ইহার কলেবর বর্ধিত এবং পুরাণসমূহের মধ্যে ইহা সামবেদসদৃশ।” শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যেই স্বয়ং সূতগোস্বামী বলিয়াছেন—এই শ্রীমদ্ভাগবতে “সর্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ভূতম্ ॥ ১।৩।৪২ ॥ সর্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিচ্ছতে ॥ ১২।১৩।১৫ ॥”

যাহা হউক, শ্রীমদ্ভাগবত যখন গায়ত্রীর ভাষ্কর্যরূপ এবং চতুঃশ্লোকীর বিবৃতিস্বরূপ, তখন চতুঃশ্লোকীই হইবে গায়ত্রীর—সুতরাং প্রণবেরও—সংক্ষিপ্ত অর্থস্বরূপ। চতুঃশ্লোকীতে যে প্রণবের অর্থ একটু বিস্তৃত ভাবেই কথিত হইয়াছে, এক্ষণে তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করা হইবে।

প্রণব ও গায়ত্রীর ত্রায় চতুঃশ্লোকীতেও সম্বন্ধ, অভিধেয় এবং প্রয়োজন এই তিন তত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে।

শ্রীভগবান্ নারায়ণ ব্রহ্মাকে যাহা বলিয়াছিলেন, ছয়টি শ্লোকে তাহা নিবদ্ধ হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম দুইটি শ্লোক উপক্রমণিকাস্থানীয়। পরবর্তী চারিটিকেই চতুঃশ্লোকী বলা হয়। আমরা প্রথমে উপক্রমণিকা-স্থানীয় শ্লোক দুইটিরই উল্লেখ করিব।

“জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমম্বিতম্।

সরহস্তং তদঙ্গং গৃহাণ গদিতং ময়া ॥ শ্রীভা, ২।৩।৩০ ॥”

শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিলেন—হে ব্রহ্মন্! (জড়বস্তু-বিষয়ক জ্ঞান হইল সাধারণ জ্ঞান, জড়াতীত নির্বিশেষ-সচ্চিদানন্দ-বিষয়ক জ্ঞান হইল গুহ্য (ইন্দ্রিয়াতীত) জ্ঞান, অন্তর্যামি-পরমাত্মা-বিষয়ক জ্ঞান হইল গুহ্যতর জ্ঞান এবং ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ লীলাময় সর্বিশেষ চতুর্ভূজরূপে যিনি তোমাকে উপদেশ দিতেছেন, সেই) আমার সম্বন্ধীয় পরম-গুহ্য (গুহ্যতম) জ্ঞানের কথা, মদ্বিষয়ক জ্ঞানের বিজ্ঞানের (বা অল্পভবের) কথা, মদ্বিষয়ক জ্ঞানলাভের যে রহস্ত (অর্থাৎ প্রেমভক্তি, যাহা সহজে ভগবান্ কাহাকেও দেন না, সুতরাং যাহা পরম গোপনীয় অর্থাৎ রহস্তময়-বস্তু) আছে, তাহার কথা এবং মদ্বিষয়ক জ্ঞানের যে অঙ্গ (অর্থাৎ প্রেমভক্তি উন্মেষিত হওয়ার অনুকূল সাধন) আছে, তাহার কথাও (আমি ব্যতীত অণু কেহ জ্ঞানে না বলিয়া আমিই) তোমাকে কথায় বলিতেছি, তুমি তৎসমস্ত গ্রহণ কর।

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্মকঃ।

তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্ত তে মদনুগ্রহাৎ ॥ শ্রীভা, ২।৩।৩১ ॥”

শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে আরও বলিলেন—ব্রহ্মন্! আমি যে স্বরূপ-বিশিষ্ট (অর্থাৎ আমি যে পরিমাণবিশিষ্ট), আমি যে লক্ষণবিশিষ্ট, আমি শ্রাম-চতুর্ভূজ-দ্বিভূজাদি যে সকল রূপবিশিষ্ট, আমি যাদৃশ-রূপগুণ-লীলাবিশিষ্ট, আমার অনুরূপে সে সমস্তের যথার্থ অনুভব তোমার হউক।

শাস্ত্রাদি আলোচনা করিয়া কিম্বা অপরের মুখে শুনিয়া তদ্বাদিসম্বন্ধে যে জ্ঞান জন্মে, তাহা হইল পরোক্ষ জ্ঞান বা আক্ষরিক জ্ঞান। এই জ্ঞান মস্তিষ্কেই থাকে, হৃদয়কে স্পর্শ করে না। এই জ্ঞানের অনুভব যখন জন্মে, তখনই তাহাকে বলে বিজ্ঞান বা অপরোক্ষ জ্ঞান। পরোক্ষ জ্ঞানের মূল্য বিশেষ কিছু নাই; তাহা আমাদের চিত্তের উপরে বিশেষ প্রভাবও বিস্তার করিতে পারে না। লোকের সাক্ষাতে আমরা কোনও অগ্রায় কাজ করি না; কারণ, লোকসম্বন্ধে আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে। কিন্তু ভগবান্ সর্বজ্ঞ, সর্বত্র বিদ্যমান—ইহা জানিয়াও (এবিষয়ে পরোক্ষ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও) আমরা অপর লোকের অলক্ষিতভাবে অগ্রায় কাজ করি, অসঙ্গত চিন্তা মনে পোষণ করি। ভগবান্ সম্বন্ধে অপরোক্ষ জ্ঞান নাই বলিয়াই আমরা অনুভব করিতে পারি না যে, আমাদের গুপ্ত কাজ বা চিন্তাও তিনি জানিতে পারেন। এই অপরোক্ষ জ্ঞান কিন্তু ভগবৎ-রূপা (অথবা ভগবদনুগৃহীত মহাপুরুষের রূপা) ব্যতীত জন্মিতে পারে না। তাই পরম-করণ ভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিলেন—“তত্ত্বের কথা আমি তোমাকে কথায় বলিয়া যাইব; তুমিও শুনিবে, শুনিয়া হয়তো মনে করিয়াও রাখিবে। কিন্তু আমার কথিত বিষয়ের অনুভব

না জন্মিলে, তাহাতে তোমার বিশেষ কোনও উপকার হইবে না। আমার কৃপা ব্যতীত তুমি নিজে নিজে অল্পভবও করিতে পারিবে না। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করিতেছি—আমার কৃপায় আমার কথিত তত্ত্বসম্বন্ধে তোমার বিজ্ঞান বা অল্পভব—অপরোক্ষ জ্ঞান—জন্মুক।

এই শ্লোক দুইটিতে—সম্বন্ধ, অভিধেয় এবং প্রয়োজন—এই তিনটি তত্ত্বেরই উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি (ভগবান্), আমার চতুর্ভূজ-দ্বিভুজাদিরূপ, আমার গুণ, আমার লীলা—এসমস্তই সম্বন্ধতত্ত্ব। আমার সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও বিজ্ঞান হইল সম্বন্ধ-তত্ত্বের জ্ঞান ও বিজ্ঞান। আমাকে (ভগবান্কে) জানিবার—অল্পভব করিবার—একমাত্র উপায় হইল প্রেম। এই প্রেমই (যাহাকে উল্লিখিত শ্লোকে রহস্য বলা হইয়াছে, সেই রহস্যই) হইল প্রয়োজন-তত্ত্ব। আর এই প্রেম-প্রাপ্তির জন্ত যে সাধন করিতে হয়, সেই সাধনই (শ্লোকে যাহাকে তদঙ্গ বলা হইয়াছে, তাহাই) অভিধেয়-তত্ত্ব।

ভগবানের রূপ-গুণ-লীলাদি হইল তাঁহার স্বরূপশক্তির বিলাস। শক্তি ও শক্তিমান্কে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না বলিয়া ভগবানের শক্তি এবং শক্তির বিলাসাদিও (অর্থাৎ তাঁহার রূপ-গুণ-লীলাদিও) তত্ত্বতঃ স্বরূপাতিরিক্ত নহে। রূপগুণাদি স্বরূপ হইতে অভিন্ন হইলেও ভেদবোধক বিশেষত্ব। বিশেষত্বের জ্ঞানেই স্বরূপের জ্ঞানের পূর্ণতা। তাই, উল্লিখিত শ্লোকদ্বয়ের প্রথম শ্লোকে কেবল স্বরূপের জ্ঞানের কথা (মে জ্ঞানং) বলিয়াও দ্বিতীয় শ্লোকের “ধাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্মকঃ।”—বাক্যে রূপগুণাদির কথা বলা হইয়াছে। রূপগুণাদির জ্ঞানও সম্বন্ধজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।

যাহা হউক, এইরূপ উপক্রম করিয়া শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে তাঁহার প্রার্থিত বিষয়গুলি পরবর্তী চতুঃশ্লোকীতে জানাইতেছেন। চতুঃশ্লোকীর প্রথম শ্লোকে সম্বন্ধতত্ত্বের কথা বলিতেছেন।

“অহমেবাসমেবাগ্রে নাগৃদ্ যং সদস্যং পরম্।

পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোহবশিষ্ঠোত সোহস্ম্যহম্ ॥ শ্রীভা ২।৩।৩২ ॥”

শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে ব্রহ্মন্! অগ্রে (সৃষ্টির পূর্বে, মহাপ্রলয়ে) আমিই ছিলাম; অন্ত যে স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ এবং তাহাদের কারণ যে প্রধান এবং যে নিরীক্শেষ ব্রহ্ম, তাহারাও আমি হইতে পৃথক্ ছিল না। সৃষ্টির পরেও (পশ্চাৎ) আমিই আছি। এই যে বিশ্ব দেখিতেছ, তাহাও আমিই। প্রলয়ে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাও আমিই।

এই শ্লোকসম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাইতেছে। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—অগ্রে অহম্ এব আসম্—আগে আমিই ছিলাম। আগে-শব্দের তাৎপর্য এই—সৃষ্টির এবং সৃষ্টির সূচনারও আগে। ভগবান্ যখন সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করেন, তখনই সৃষ্টির সূচনা (তাহার পরে মায়ায় প্রতি দৃষ্টি, তারপর প্রকৃতির বিক্ষোভাদি)। এই সূচনার অর্থাৎ ভগবানের মনে সৃষ্টিবাসনা জন্মিবারও পূর্বে, যখন মহাপ্রলয় চলিতেছিল, সেই সময়টাই আগে-শব্দে সূচিত হইতেছে। ভগবান্ বলিতেছেন—মহাপ্রলয়ের সময়েও আমিই—হে ব্রহ্মন্! যে আমি তোমাকে কৃপা করিয়াছি, তোমার করস্পর্শ করিয়া বর-প্রার্থনার আদেশ করিয়াছি, তুমি যে-আমার ধাম বৈকুণ্ঠের দর্শন পাইয়াছ, বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী-আদি যে-আমার পরিকর-বর্গের দর্শন পাইয়াছ, অশেষ-ঐশ্বর্য্যপূর্ণ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভূজ যে-আমি তোমাকে তত্ত্বোপদেশ করিতেছি, সেই আমিই, মহাপ্রলয় যখন চলিতেছিল, তখন—ছিলাম।

কোনও স্থানে রাজা আসিয়াছেন বলিলে রাজা একাকী আসেন নাই, তাঁহার পরিকরবর্গও আসিয়াছেন, ইহাই বুঝায়, (যথা রাজ্যসৌ গচ্ছতি ইত্যুক্তে সপরিবারস্ত রাজ্ঞো গমনমুক্তং ভবতি তদ্বৎ ॥ বেদান্তসূত্র। ১।১।১-সূত্রের শঙ্করভাষ্য।) অথচ পরিকরবর্গের উল্লেখ সাধারণতঃ থাকে না। তদ্রূপ, এস্থলে “আমি ছিলাম” বলাতেও “আমার পরিকরবর্গও ছিলেন” তাহাই বুঝাইতেছে। বিশেষতঃ ব্রহ্মাও ভগবানের ধাম এবং পরিকরবর্গ দর্শন করিয়াছেন—যদিও ব্রহ্মার এই দর্শন-সময়ে তাঁহার ব্যষ্টিসৃষ্টির আরম্ভও হয় নাই। প্রশ্ন হইতে পারে, ভগবানের পরিকরবর্গও মহাপ্রলয়ে থাকিয়া থাকিলে “এব—অহম্ এব”—আমিই ছিলাম বলা হইল কেন? “এব”-শব্দের সার্থকতা কি?

চতুর্দশ-ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ডাদি তখন ছিল না—ইহাই এব-শব্দের ব্যঞ্জনা। সপরিকর আমিই ছিলাম—ইহাই তাৎপর্য। কাশীখণ্ডের প্রবচরিত হইতে জানা যায়—মহাপ্রলয়েও ভগবদ্ভক্তগণ তাঁহাদের স্বরূপচ্যুত হন না, তখনও তাঁহারা ভগবৎ-সেবকরূপেই বর্তমান থাকেন। “ন চ্যবন্তেহপি যদুভক্তা মহত্যাঃ প্রলয়াপদি। অতোহুচ্যাতোহথিলে লোকে স একঃ সর্বগোহব্যয়ঃ॥” সাধনসিদ্ধ জীবদের সম্বন্ধেই একথা। নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের নিত্যত্ব-সম্বন্ধে কথাই উঠিতে পারে না।

আবার প্রশ্ন হইতে পারে, ভগবানের যে পরিকর আছেন, তাহারই বা প্রমাণ কি? প্রমাণ বেদান্ত-সূত্রেই পাওয়া যায়। “লোকবন্তু লীলাকৈবল্যম্॥ ২।১।৩৩॥”—সূত্রে ব্রহ্মের বা ভগবানের লীলার কথা জানা যায়। লীলা বা খেলা একাকী হয় না। লীলার সঙ্গী চাই। লীলাসঙ্গীরাই পরিকর। গোপালতাপনী শ্রুতিতে বহু লীলাপরিকরের নাম দৃষ্ট হয়; তাহা প্রবন্ধান্তরে দেখান হইয়াছে। “রাধয়া মাধবো দেবো মাধবৈনৈব রাধিকা।”—ইত্যাদি ঋকৃপরিশিষ্ট-বাক্যেও পরিকর-শিরোমণি শ্রীরাধার নাম দৃষ্ট হয়।

পরিকরগণের অস্তিত্বে লীলার অস্তিত্বও সূচিত হয়। মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টি-আদিরূপ লীলা থাকে না বটে; কিন্তু স্বীয় পরিকরবর্গের সহিত ভগবানের অন্তরঙ্গলীলা চলিতেই থাকে। রাজা এখন কোনও কাজ করিতেছেন না বলিলে যেমন তিনি রাজসম্বন্ধি কোনও কাজ করিতেছেন না—ইহাই বুঝায়; কিন্তু তিনি শয়ন-ভোজনাদি অন্তঃপুর-করণীয় কার্যাদিও করিতেছেন না, ইহা যেমন বুঝায় না—তদ্রূপ।

লীলার অস্তিত্বে আরও একটা তথ্য সূচিত হইতেছে। “একোহপি সন্ যো বহুধাবভাতি”—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়, পরব্রহ্ম এক বিগ্রহেই নানা রূপ ধারণ করেন। এই নানা রূপ হইল রসস্বরূপ ভগবানের অনন্ত রসবৈচিত্রীর মূর্তি বিগ্রহ। এই অনন্তরূপে পরিকরবর্গের সহিত তিনি অনন্ত-লীলারস-বৈচিত্রীর আনন্দন করেন। শ্লোকস্থ “অহম্—আমি”—শব্দে এই অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপকেও—নারায়ণ-রাম-নৃসিংহাদি এবং শ্রীকৃষ্ণাদি অনন্ত রূপকেও—এবং তাঁহাদের পরিকরবর্গকেও বুঝাইতেছে; যেহেতু, ভগবান্ এক বিগ্রহেই বহু।

তাহা হইলে বুঝা গেল—শ্রীভগবান্ তাঁহার অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ, প্রত্যেক স্বরূপের ধাম, লীলা এবং লীলাপরিকর—এই সমস্তই শ্লোকস্থ “আমি”—শব্দের অন্তর্ভুক্ত। মহাপ্রলয়েও এই সমস্ত বিद्यমান ছিল।

মহাপ্রলয়ে ভগবান্ যে সবিশেষরূপেই বিद्यমান ছিলেন, তাহার শ্রুতিপ্রমাণও আছে। “বাসুদেবো বা ইদমগ্র আসীৎ ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ।—মহাপ্রলয়ে বাসুদেব (শ্রীকৃষ্ণই) ছিলেন; ব্রহ্মাও ছিলেন না, শঙ্করও ছিলেন না। একো নারায়ণ আসীৎ ব্রহ্মা নেশানঃ।—এক নারায়ণই (যিনি ব্রহ্মাকে উপদেশ দিতেছেন, তিনিই) ছিলেন; ব্রহ্মাও ছিলেন না, ঈশানও ছিলেন না। ক্রমসম্ভবত্ব শ্রুতিবাক্য।” ঐতরের শ্রুতিও বলেন—“আত্মা বা ইদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ।—অগ্রে—মহাপ্রলয়ে—এই পুরুষাকার (সবিশেষ) আত্মাই ছিলেন।” ঐতরের-শ্রুতির এই উক্তি মহাপ্রলয়-সময়-সম্বন্ধে—প্রকৃতির প্রতি ভগবানের দৃষ্টিপাতের পূর্বসময়-সম্বন্ধে। প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাতের পরেই গর্ভোদশায়ী আদি পুরুষের প্রকাশ। সুতরাং এই শ্রুতিবাক্যে যে পুরুষের কথা বলা হইয়াছে, তিনি গর্ভোদশায়ী-আদি নহেন; তাঁহাদেরও অতীত, তাঁহাদেরও মূলীভূত কারণ শ্রীভগবান্ এই শ্রুতিবাক্যের লক্ষ্য।

উপক্রম-শ্লোকস্থ “জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে” এবং “যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপ গুণকর্মকঃ।”—বাক্যদ্বয়ে যাহা বলা হইয়াছে, এই শ্লোকের “অহমেবাসমেবাগ্রে”—বাক্যও তাহাই বলা হইয়াছে। প্রণবের এক অংশের অর্থ—পরব্রহ্ম; গায়ত্রীর শিরোভাগেও পরব্রহ্মের কথা এবং ব্রহ্মলোকের কথাও বলা হইয়াছে। চতুঃশ্লোকীর প্রথম-শ্লোকের “অহমেবাসমেবাগ্রে”—অংশেও সেই পরব্রহ্মের, তাঁহার ধাম-পরিকরাদির কথাই উল্লিখিত হইয়াছে।

প্রণবের অর্থে প্রণব বা ব্রহ্মকে “সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ সর্বেশ্বর অন্তর্গামী” ইত্যাদি বলাতে এবং গায়ত্রীতেও তাঁহাকে সবিতা বলাতে এবং তাঁহার “ভর্গ বা তেজ বা শক্তিঃ” কথা বলাতে—প্রণবের বা ব্রহ্মের সবিশেষত্বই খ্যাপিত হইয়াছে। গীতাতেও পরব্রহ্মের সবিশেষত্বের প্রমাণই পাওয়া গিয়াছে। চতুঃশ্লোকীতেও তাহাই প্রতি-পাদিত হইয়াছে। ইহাছারা নির্বিশেষবাদও খণ্ডিত হইতেছে।

নাগ্ৰহ যৎ সদসংপরম্ । অগ্ৰং যং সং অসং পরম্ ন । যং সং অসং অগ্ৰং ন, পরং অগ্ৰং ন । সং—স্থূল; পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডাদি । অসং—সূক্ষ্ম; ব্রহ্মাণ্ডাদির সূক্ষ্ম অবস্থা—স্থূলত্বপ্রাপ্তির পূর্বাৱস্থা, মহত্ত্বাদি । অগ্ৰং—অগ্ৰ । অগ্ৰ যে স্থূল বা সূক্ষ্ম জগৎ, তাহাও পৃথক্ ভাবে ছিল না । মহাপ্রলয়ের পূর্বেই স্থূল জগৎ সূক্ষ্ম মহত্ত্বাদিতে এবং সূক্ষ্ম মহত্ত্বাদি প্রকৃতিতে লীন হইয়া যায় এবং এই সমস্ত সহ প্রকৃতি ভগবানের স্বরূপবিশেষ কারণাবশ্যায়ীতে লীন হইয়া থাকে । যতকাল মহাপ্রলয় চলিতে থাকে, ততকালই এই সমস্ত কারণাবশ্যায়ীতে লীন থাকে, তাহাদের পৃথক্ কোনও অস্তিত্ব থাকেনা । একথাই ভগবান্ বলিতেছেন—“হে ব্রহ্মন্! মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ডাদি স্থূল পরিদৃশ্যমানরূপেও ছিলনা, সূক্ষ্ম মহত্ত্বাদিরূপেও ছিলনা, তাহাদের কারণ প্রকৃতিতেও লীন অবস্থায় ছিল না । প্রকৃতিসহ তৎসমস্ত আমাতেই (আমার স্বরূপবিশেষ কারণাবশ্যায়ীতেই) লীন ছিল, তাহাদের পৃথক্ কোনও অস্তিত্ব ছিল না ।”

পরং অগ্ৰং ন—পরং—স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতের পর বা অতীত । স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ হইল জড়; তাহাদের অতীত হইল জড়াতীত; চিং; চিন্মাত্র-সত্ত্বা, নির্কির্শেষ ব্রহ্ম । কেহ কেহ বলেন—জড় জগতের অভাবে, মহাপ্রলয়ে জড় জগতের স্থলে সর্বব্যাপক নির্কির্শেষ ব্রহ্ম ছিলেন । তদুত্তরেই যেন ভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিলেন—পরং ন অগ্ৰং; সেই নির্কির্শেষ ব্রহ্মও আমা হইতে অগ্ৰ বা পৃথক্ নহেন; তাহা আমারই প্রকাশ-বিশেষ । গীতার “ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্ ।”—বাক্যেরই ইহা তাৎপর্য ।

পশ্চাদহম্ । পশ্চাৎ (পরেও—সৃষ্টির পরেও) অহম্ (আমি) । ব্রহ্মন্! প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির পরেও আমিই থাকি । যখন সৃষ্টি করিবার জ্ঞান আমার ইচ্ছা হয়, তখন প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রকৃতিকে বিক্ষোভিত করি; ক্রমে মহত্ত্বাদির এবং অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের এবং তাহারও পরে অনন্তকোটি ব্যষ্টিজীবের সৃষ্টি হয় । প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের এবং প্রত্যেক জীবের অন্তর্য্যামিরূপে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে আমি অবস্থান করি এবং আমার পার্শ্বদেবের সঙ্গে লীলা-বিলাসারূপেও আমার নিত্য চিন্ময়ধামে তখনও (মহাপ্রলয়ে যেমন ছিলাম, তেমনি) আমি অবস্থান করি ।

এপর্য্যন্ত প্রণবোক্ত পরব্রহ্মের পরিচয় গেল । সৃষ্ট জগৎ ত্রিকালের অধীন । তাহার বাহিরেও যে কালাতীত ব্রহ্মের পরিচয় প্রণবের অর্থে পাওয়া গিয়াছে, উল্লিখিত “পশ্চাদহম্”—বাক্যে তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে । ভগবান্ অন্তর্য্যামিরূপে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডেও আছেন, প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের অতীত কালাতীত চিন্ময় ভগবদ্ধামেও আছেন ।

মহাপ্রলয়ে সপরিকর ভগবান্ ব্যতীত অপর কেহ যখন ছিলেন না এবং তাহার পরেই যখন প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইল, তখন ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, জগতের সৃষ্টিকর্ত্তাও ভগবান্ই । ইহা গায়ত্রীর “সবিতা”—শব্দের এবং প্রণবের “সর্বস্ব প্রভবাপ্যায়ো হি ভূতানাং”—বাক্যেরই তাৎপর্য ।

যদেতচ্চ । যদেতৎ বিংশং তদপি অহমেব মদনগ্ৰহাং মামকমেব (ক্রমসন্দর্ভঃ) । সকলের পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডও আমিই; কারণ, আমি ব্যতীত যখন অগ্ৰ কিছুই নাই, তখন এই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডও আমা হইতে পৃথক্ নহে; আমিই (অর্থাৎ আমার বহিরঙ্গা শক্তি মায়াই) ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণত হইয়াছি; সূতরাং ব্রহ্মাণ্ড আমারই । সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম—এই শ্রুতিবাক্যেও তাহাই প্রকাশ পাইতেছে; এই সমগ্র জগৎ ব্রহ্মই, ব্রহ্মের পরিণামই, ব্রহ্ম হইতে অভিন্নই—যেমন তরঙ্গ সমুদ্র হইতে অভিন্ন । শক্তি শক্তিমান্ হইতে অভিন্ন । ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়ায় পরিণতি হইল প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড । সূতরাং প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডও ভগবান্ হইতে অভিন্ন । কিন্তু তরঙ্গ যেমন সমুদ্র নয়, তদ্রূপ ব্রহ্মাণ্ডও ভগবান্ নহেন । তরঙ্গ যেমন সমুদ্র হইতে অভিন্ন নয়, অথচ সমুদ্র তরঙ্গ হইতে ভিন্ন; সূর্য্যের কিরণ যেমন সূর্য্য হইতে ভিন্ন নয়, অথচ কিরণ হইতে সূর্য্য ভিন্ন; তদ্রূপ ব্রহ্মাণ্ড ভগবান্ হইতে ভিন্ন নয়, অথচ ভগবান্ ব্রহ্মাণ্ড হইতে ভিন্ন । “তদেবং ভেদেহপি লক্কে যদুত্তরত্র বহুনাং জন্মনামিত্যাদৌ বাসুদেবঃ সর্বমিতি (গীতায়াং) জ্ঞানবান্ মাং প্রপণত ইত্যত্র প্রতিপাদ্যে যদভেদ ইব শ্রুয়তে তৎখলু সূর্য্যতদ-

যশ্যাদিবং বাসুদেবাং সর্বং ন ভিন্নং সর্বস্যাং বাসুদেবো ভিন্ন ইত্যেব সঙ্কচ্ছেতে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ১।২।১৪ শ্লোক-টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী। “ভগবান্ হইতে জগৎ অভিন্ন হওয়ার হেতু এই যে, ভগবান্ হইতেই জগতের উৎপত্তি, ভগবানের সত্ত্বাতেই জগতের সত্ত্বা। আর জগৎ হইতে ভগবান্ ভিন্ন হওয়ার হেতু এই যে—জগৎ হইল জড়বস্তু এবং ভগবান্ হইলেন চিদ্রস্তু। এস্থলে জগৎ ও ব্রহ্মাণ্ডের সম্যক-অভেদবাদ নিরাকৃত হইল।

পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতির কারণও যে ভগবান্, তাহাও যদেতচ্চ-বাক্যে স্মৃতিত হইল।

প্রণবের অর্থে এবং গীতার ব্যাখ্যাতিতে অপর ব্রহ্মের কথা জানা গিয়াছে। যদেতচ্চ-বাক্যেও তাহাই জানা গেল।

যোহবশিষ্ঠোত সোহস্ম্যহন্। মহাপ্রলয়ে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাও আমিই। সৃষ্টবস্তু মাত্রেরই বিনাশ আছে, তাই সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডেরও ধ্বংস আছে।—প্রলয়ে এই স্থূল ব্রহ্মাণ্ড কিরূপে প্রকৃতির সঙ্গে ভগবানে (ভগবানের প্রকাশবিশেষ কারণার্ণবশায়ীতে) লীন হইয়া থাকে, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড তখন না থাকাতে একমাত্র ভগবান্ই তখন অবশিষ্ট থাকেন। তাহাই এস্থলে বলা হইল। জগতের ধ্বংসের বা লয়ের কারণও যে ভগবান্, তাহাও এস্থলে স্মৃতিত হইল।

প্রণবের অর্থে জানা গিয়াছিল, পরিদৃশ্যমান জগতের উৎপত্তি-স্থিতি-লয়ের কারণ ব্রহ্ম। এই শ্লোকে, “যদেতচ্চ যোহবশিষ্ঠোত সোহস্ম্যহন্”—বাক্যেও তাহাই জানা গেল।

চতুঃশ্লোকীর এই প্রথম-শ্লোকটিতে পরব্রহ্ম এবং অপর-ব্রহ্মের পরিচয় পাওয়া গেল। সুতরাং এই শ্লোকটি হইল প্রণব ও গায়ত্রী কথিত সঙ্ক-তত্ত্বের পরিচায়ক। প্রণবে এককে সর্ববিশেষ বলাতে তাঁহার শক্তির ইঙ্গিতমাত্র দেওয়া হইয়াছে। গায়ত্রীতে “ভর্গ”-শব্দে তাঁহার শক্তির স্পষ্ট উল্লেখ করা হইয়াছে। গীতাতে সেই শক্তির আরও বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। চতুঃশ্লোকীর এই প্রথম শ্লোকটিতে তদধিক বিশেষ পরিচয় মিলিয়াছে—পরব্রহ্ম ভগবানের লীলা, ধাম, পরিকরাদির উল্লেখ। প্রণব ও গায়ত্রীর দ্বারা এই চতুঃশ্লোকীও জানাইতেছে—ভগবান্ ব্যতীত অণু কোনও পৃথক বস্তুই কোথাও নাই, তিনিই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের মূল, জগতের সঙ্গে তাঁহার একটা নিত্য অচ্ছেদ্য সঙ্ক আছে, তাই তিনিই সঙ্কতত্ত্ব।

“যাবানহং যথাভাবঃ”—ইত্যাদি শ্লোকে যে যে বিষয়ে অনুভূতি লাভের অণু ভগবান্ ব্রহ্মাকে কৃপা করিলেন, এই শ্লোকে সেই সেই বিষয়েরই উপদেশ করিয়াছেন। এই শ্লোকে যাহা বলা হইল, তাহাতে জানা গেল—ভগবান্ দেশ-কালাদির অতীত, সর্বদেশ-সর্বকাল ব্যাপিয়া তিনি এবং তাঁহার ধাম-পরিকর-লীলা-স্বরূপাদি নিত্য বিরাজিত। ইহা দ্বারা পূর্বশ্লোকস্থ “যাবান্—যৎপরিমাণক”—অংশের তত্ত্ব প্রকাশ করা হইল। “নাণ্ডদ্যং সদস্য পরম্”—ইত্যাদি বাক্যে, স্থূল-সূক্ষ্মজগৎ এবং তাহার মূল প্রকৃতি যে তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মও যে তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে—এই তত্ত্বকথায় তাঁহার “যথাভাবত্ব—যলক্ষণত্ব”—প্রকাশ করা হইয়াছে। আর তিনি অনন্ত-ভগবৎ-স্বরূপরূপে বিরাজিত—এই সূচনাদ্বারা তাঁহার রূপের কথা, ব্রহ্মাণ্ডাদি সকলের আশ্রয়ত্ব-সূচনাদ্বারা তাঁহার অনন্ত গুণের কথা, এবং জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াদির উল্লেখে তাঁহার বহিরঙ্গা লীলার কথা এবং তদুপলক্ষণে—বিশেষতঃ তাঁহার ধাম পরিকরাদির সূচনায় অন্তরঙ্গা লীলার কথা দ্বারা তাঁহার অনন্ত কর্ম বা লীলার কথা—এইরূপে “যদ্রপগুণ কর্মকঃ”—অংশের তত্ত্ব প্রকাশ করা হইয়াছে।

ব্রহ্মা যে ভগবানের স্থূল রূপ (অপর ব্রহ্ম) এবং সূক্ষ্মরূপের (পরব্রহ্মের) রহস্ত জানিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাও এই শ্লোকে জানান হইল।

জগৎ-সৃষ্টিক্রম বহিরঙ্গালীলা সম্পাদিত হয় ভগবানের বহিরঙ্গা মায়াশক্তির আনুকূল্যে এবং অন্তরঙ্গা লীলা সম্পাদিত হয় তাঁহার অন্তরঙ্গা চিহ্নক্তির বিলাসবিশেষ যোগমায়ায় আনুকূল্যে। এইরূপে, মায়া (বহিরঙ্গা মায়া এবং যোগমায়া) সহযোগে ভগবানের লীলা কিরূপ—তাহাও ব্রহ্মাকে জানান হইল।

এই শ্লোকে অম্বয়ীমুখেই ব্রহ্মের বা ভগবানের স্বরূপের কথা বলা হইয়াছে। পরবর্তী শ্লোকে ব্যতিরেকীমুখে তাহা বলা হইতেছে। সুতরাং পরবর্তী শ্লোকেও সম্বন্ধ-তত্ত্বের কথাই বলা হইতেছে—পূর্বশ্লোকে অম্বয়ীমুখে এবং পরবর্তী শ্লোকে ব্যতিরেকীমুখে।

বাস্তবিক, অম্বয়ী ও ব্যতিরেকী এই উভয় রূপে না বুঝাইলে কোনও বস্তুর স্বরূপের উপলব্ধিতে ভ্রম হইতে পারে। আকাশে উদ্ভিত সূর্যকে দেখাইয়া, জগতে বিকীর্ণ তাহার আলো দেখাইয়া অম্বয়ী মুখে সূর্যের পরিচয় কাহারও নিকটে দেওয়া যায়। কিন্তু তাহাই যথেষ্ট নয়। জলে যে সূর্যের প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তাহাকেও দেখিতে সূর্যের মত মনে হয়। তাহা দেখিয়া যদি কেহ মনে করে—ইহাই সূর্য, তাহা হইলে তাহার ভ্রান্তিমাত্রই প্রকাশ পাইবে। তাই আকাশে সূর্য দেখাইবার (অর্থাৎ অম্বয়ীমুখে সূর্যের পরিচয় দেওয়ার) সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে ইহাও জানাইতে হইবে যে, জলে সূর্যের যে প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, তাহা কিন্তু সূর্য নয় (ইহাই ব্যতিরেকী মুখে সূর্যের পরিচয়)। ইহা যদি জানান যায়, তাহা হইলেই জলে প্রতিবিম্ব দেখিয়া কাহারও সূর্য বলিয়া ভ্রম জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে না।

এজন্তই ভগবান্ “অহমেবাসমেবাগ্রে”-শ্লোকে অম্বয়ীমুখে ভগবানের বা ব্রহ্মের স্বরূপের পরিচয় দিয়া পরবর্তী শ্লোকে আবার ব্যতিরেকী-মুখে তাহার পরিচয় দিতেছেন। ব্রহ্ম কি বস্তু—ইহাই অম্বয়ীমুখে পরিচয়। আর ব্রহ্ম কি নহেন—ইহাই ব্যতিরেকী মুখে পরিচয়।

ব্যতিরেকীমুখে ব্রহ্মের স্বরূপ-জ্ঞাপক দ্বিতীয় শ্লোকটি এই।

ঋতেহর্থং যং প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।

তদ্বিদ্ধাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ ॥ শ্রীভা, ১।৯।৩৩ ॥

শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিলেন—পরমার্থবস্তু-আমা-ব্যতিরেকে (অর্থাৎ আমার প্রতীতি না হইলেই) যাহার প্রতীতি হয় (অর্থাৎ আমার প্রতীতি হইলে যাহার প্রতীতি হয় না বলিয়া আমার বাহিরেই যাহার প্রতীতি হয়), (আমার আশ্রয়ত্ব ব্যতীতও আবার) স্বতঃ যাহার প্রতীতি হয় না, তাহাকেই আমার মায়া বলিয়া জানিবে। যেমন আভাস বা প্রতিচ্ছবি, আর যেমন অন্ধকার।

ভগবান্ মায়ার দুইটা লক্ষণ বলিলেন—(১) ঋতেহর্থং যং প্রতীয়েত, তদ্বিদ্ধাং আত্মনঃ মায়াং—অর্থঃ (পরমার্থঃ) ঋতে (বিনা—পরমার্থভূত আমার প্রতীতি না হইলে) যং প্রতীয়েত (যাহার প্রতীতি হয়), তাহাই আমার মায়া এবং (২) ন প্রতীয়েত চ আত্মনি, তদ্বিদ্ধাং আত্মনঃ মায়াং—(যাহা) আত্মনি (নিজেতে—নিজে নিজে, আমায় আশ্রয় ব্যতীত) ন প্রতীয়েত (প্রতীতি জন্মাইতে পারে না), তাহাকে আমার মায়া বলিয়া জানিবে। আমরা দ্বিতীয় লক্ষণটির আলোচনা প্রথমে করিব।

ন প্রতীয়েত আত্মনি। ভগবানের আশ্রয় ব্যতীত, ভগবানের সম্বন্ধহীনভাবে যাহা নিজে নিজে প্রকাশ করিতে পারে না, তাহা মায়া।

শ্রুতি হইতে জানা যায়, ভগবান্ যখন প্রজা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি মায়ার প্রতি দৃষ্টি করেন। গীতার “দৈবী হেযা গুণময়ী মম মায়া”-ইত্যাদি শ্লোক হইতে জানা যায়, মায়ার উপাদান হইতেছে গুণ (উপাদানার্থে ময়ট্রপ্রত্যয়); মায়াতে তিনটা গুণ আছে—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। তাই মায়াকে ত্রিগুণাত্মিকা বলে। মহাপ্রলয়ে এই তিনটা গুণ সাম্যাবস্থায় থাকে। বাহিরের কোনও শক্তির ক্রিয়া ব্যতীত কোনও বস্তুর সাম্যাবস্থা নষ্ট হইতে পারে না। ভগবান্ মায়ার প্রতি দৃষ্টি করিয়া শক্তিসঞ্চার করিলেন, তাহাতেই মায়ার সাম্যাবস্থা নষ্ট হইল, মায়া বিক্ষুণ্ণ হইল; তাহারই ফলে মায়া ক্রমশঃ মহত্ত্ব, অহঙ্কারত্ব, তন্মাত্রাদিতে পরিণতি লাভ করিল এবং তাহা হইতে ব্রহ্মাণ্ডটির উৎপত্তি হইল। শক্তি-সঞ্চারের পরে ভগবানের (ভগবানের স্বরূপবিশেষ কারণার্ণবশায়ীর) দেহে লীন জীবাত্মা-সমূহকেও তিনি মায়াতে নিক্ষেপ করিলেন; তাহাতে জীবসমূহও তাহাদের স্ব-স্ব-কর্মফলসহ আসিয়া সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে উপস্থিত হইল। তাহারা তাহাদের কর্মফল-অম্বয়ী দেহ পাইল এবং কর্মফল-ভোগের অমুকুল

অব্যাদিরও সৃষ্টি হইল। এই সৃষ্টি পর্যন্ত হইল মায়ায় গুণের কাজ। গুণের দ্বারা জগৎ-সৃষ্টিকারিণী মায়ায় এই বৃত্তিকে বলে গুণমায়া। এইরূপে মায়া যে সৃষ্টব্রহ্মাণ্ডরূপে আত্মপ্রকাশ করিল, তাহা অন্তরীকরপে নহে, কেবল নিজের প্রভাবে নহে। সৃষ্টির জন্ত ভগবানের ইচ্ছা হওয়াতেই এবং তিনি দৃষ্টিদ্বারা মায়াতে শক্তিসঞ্চার করিতেই মায়া জগদ্রূপে আত্মপ্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ভগবানের শক্তির সহায়তা ব্যতীতই যদি জগদ্রূপে নিজেকে প্রকাশ করার সামর্থ্য মায়ায় থাকিত, তাহা হইলে মহাপ্রলয়ে—যখন ভগবান্ সৃষ্টির ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই, তখনও—মায়া জগদ্রূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিত। তাহা করে নাই, পারে নাই বলিয়াই করে নাই। ইহাতেই বুঝা যায়, ভগবানের শক্তিব্যতীত মায়া নিজেকে প্রকাশ করিতে পারে না। “ন প্রতীয়তে আত্মনি”—বাক্যে ভগবান্ ব্রহ্মার নিকটে একথাই বলিয়াছেন।

সৃষ্টির পরে জীব যখন ভোগায়তন দেহ লইয়া জগতে আসিল, তখন মায়ায় আর একটি নূতন কাজের সূচনা হইল। কর্মফল ভোগের জন্তই জীব এই মায়িক জগতে আসে। তাহাকে কর্মফল ভোগ করাইবার জন্ত মায়া দুইটি কাজ করে—জীবের স্বরূপের জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখে এবং তাহার দেহেতে আত্মবুদ্ধি জন্মাইয়া ভোগ্যবস্তুর মমতাবুদ্ধি জন্মায়। মায়া যে শক্তিতে জীবের স্বরূপের জ্ঞানকে ভুলাইয়া রাখে, তাকে বলে আবরণাত্মিকা শক্তি এবং যে শক্তিতে জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি জন্মায় এবং ভোগ্যবস্তুর মমতাবুদ্ধি জন্মায়, তাকে বলে বিক্ষেপাত্মিকা শক্তি। মায়ায় যে বৃত্তিতে এই দুইটি শক্তি প্রকাশিত হয়, তাকে বলে জীবমায়া—এই জীবমায়ায় প্রভাব কেবল জীবের উপরে। দৃষ্টিদ্বারা ভগবান্ মায়াতে যে শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, তাহাই গুণমায়ায় জগৎ-সৃষ্টির যোগ্যতা দিয়াছে এবং তাহাই আবার জীবমায়ায় জীবমোহনের শক্তি দিয়াছে। ঈশ্বরের শক্তি না পাইলে গুণমায়াও জগৎ-সৃষ্টি করিতে পারিতনা, জীবমায়াও জীবকে মুগ্ধ করিতে পারিত না—অর্থাৎ গুণমায়াও আত্মপ্রকাশ করিতে পারিত না, জীবমায়াও আত্মপ্রকাশ করিতে পারিত না। মায়ায় এই উভয়প্রকার আত্মবিকাশের মূলেই রহিয়াছে ঈশ্বরের শক্তি। “ন প্রতীয়তে আত্মনি”—বাক্যে ইহাই প্রকাশ করা হইয়াছে। ঈশ্বর-নিরপেক্ষভাবে, ঈশ্বরের শক্তি না পাইলে মায়া কেবল নিজের প্রভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। ঈশ্বরের শক্তিব্যতীত আত্মপ্রকাশ করার সামর্থ্য মায়ায় থাকিলে মহাপ্রলয়েও আত্মপ্রকাশ করিতে পারিত। ইহাই মায়ায় একটি লক্ষণ।

এক্ষণে দ্বিতীয় লক্ষণটির বিষয় আলোচনা করা যাউক।

অর্থঃ ঋতে যৎ প্রতীয়েত—পরমার্থভূত ঈশ্বরের প্রতীতি ব্যতীত যাহার প্রতীতি হয়। প্রতীতি বলিতে উন্মুখতা, অনুভব বুঝায়। প্রতীতি—প্রতি+ই+ক্তি। ই-ধাতু গমনে। প্রতীতি—আভিমুখে গমন; উন্মুখতা। ভগবানের সহিত সম্বন্ধের জ্ঞান যাহার ক্ষুরিত হইয়াছে, ভগবানে বাস্তব-উন্মুখতা তাঁহারই। বাস্তব-উন্মুখতা যাহার আছে, ভগবদনুভবও তাঁহারই। তাই প্রতীতি-শব্দে ভগবদনুভবই সূচিত হইতেছে। ভগবদনুভব যে স্থলে নাই, সে স্থলেই মায়ায় অনুভব। ইহাই “অর্থঃ ঋতে যৎ প্রতীয়েত”—বাক্যের তাৎপর্য।

যাহাদের ভগবদনুভব জন্মিয়াছে, তাঁহাদের কর্মফল থাকেনা। সুতরাং কর্মফল ভোগের জন্ত সৃষ্টির প্রারম্ভে ভগবান্ ও তাঁহাদিগকে মায়ায় প্রতি নিক্ষেপ করেন না। গুণমায়ায়ও তাই তাঁহাদের জন্ত ভোগায়তন দেহ সৃষ্টি করিতে হয় না—সুতরাং জীবমায়ায় পক্ষেও তাঁহাদিগকে মোহিত করার সুযোগ উপস্থিত হয় না। তাঁহাদের পক্ষে মায়ায় অনুভবের—মায়ায় প্রভাব অনুভবের—সম্ভাবনা নাই; তাঁহাদের সম্বন্ধে মায়া আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না।

কিন্তু যে সমস্ত জীব ভগবদনুভব-শূন্য (অর্থঃ ঋতে), তাঁহাদের কর্মফল আছে; সৃষ্টির প্রারম্ভে কর্মফল ভোগের জন্ত ভগবান্ তাঁহাদিগকেই মায়ায় প্রতি নিক্ষেপ করেন। তাঁহাদের জন্ত গুণমায়ায় ভোগায়তন দেহের এবং তাঁহাদের ভোগ্যবস্তুরও সৃষ্টি করিতে হয় এবং সেই দেহে কর্মফল ভোগ করাইবার জন্ত জীবমায়ায়ও তাঁহাদের স্বরূপের বিস্মৃতি জন্মাইয়া দেহে আত্মবুদ্ধি এবং ভোগ্যবস্তুর মমতাবুদ্ধি জন্মাইতে হয়—অর্থাৎ তাঁহাদের সম্বন্ধে

মায়াকে তাহার উভয় বৃত্তিতেই আত্মপ্রকাশ করিতে হয়। ভোগায়তন দেহে মাযিক ভোগ্যবস্তু উপভোগ করিয়া তাঁহারাই মায়ার অনুভব (প্রতীতি) লাভ করেন। ইহাই “অর্থং ঋতে যং প্রতীয়েত”-বাক্যের তাৎপর্য। ভগবদনুভবহীন জীবের নিকটেই মায়া আত্মবিকাশ করিতে পারে, ভগবদনুভবযুক্ত জীবের নিকটে পারে না— ইহাও মায়ার একটি লক্ষণ।

উক্ত আলোচনার মধ্যে লক্ষ্য করিবার একটি বিষয় আছে। ভগবান্ যে সমস্ত জীবকে (জীবাত্মাকে) মায়ার প্রতি নিষ্ক্ষেপ করেন, সে সমস্ত কৰ্মফল-ভোগলিপ্সু জীবের জগুই গুণমায়াকে ভোগায়তন দেহ এবং ভোগ্যবস্তু সৃষ্টি করিতে হয় এবং জীবমায়াও সে সমস্ত জীবকেই মোহিত করে। ভগবানের জগু কোনও ভোগায়তন দেহই গুণমায়াকে সৃষ্টি করিতে হয় না; সুতরাং জীবমায়ার পক্ষেও ভগবান্কে মোহিত করার প্রশ্নও উঠে না। পূর্বশ্লোকেই বলা হইয়াছে, ভগবান্ মহাপ্রলয়েও স্বীয় নিত্য চিন্ময় দেহে বিরাজিত, সৃষ্টির পরেও সেই দেহেই বিরাজিত। সৃষ্টির সূচনায় যখন তিনি মায়ার প্রতি ঈক্ষণ করেন, তখনও তিনি তাঁহার নিত্য দেহেই বিরাজিত; সুতরাং তাঁহার জগু দেহসৃষ্টির কোনও প্রয়োজন হয় না। পূর্বশ্লোকে ইহাও সূচিত হইয়াছে যে, মহাপ্রলয়েও ভগবান্ স্বীয় নিত্য পরিকরদের সহিত লীলাবিলাস করিয়া লীলারস আশ্বাদন করিতেছেন, সৃষ্টির পরেও তাহাই করিতেছেন (পশ্চাদহম্)। লীলারসই রসস্বরূপ ভগবানের একমাত্র উপভোগ্য বস্তু। বিশেষতঃ, জীবের ন্যায় ভগবানের কোনও কৰ্মফলও নাই। তিনি যে কৰ্ম করেন, তাহা তাঁহার লীলা; তাঁহার এই লীলারূপ কৰ্ম তাঁহার কোনও পূর্বকৰ্ম হইতেও উদ্ভূত নয়; আনন্দস্বরূপের আনন্দোচ্ছাসেই তাঁহার লীলারূপ কৰ্মের স্ফূর্তি; জীবের ন্যায় তাঁহার কোনও কৰ্মফল না থাকাতে এবং কৰ্মফল অনুঘাতী কোনও ভোগ্যবস্তুর প্রয়োজনও তাঁহার না থাকাতে গুণমায়াকে তাঁহার জগু কোনও ভোগ্যবস্তুর সৃষ্টিও করিতে হয় না—সুতরাং জীবমায়ার পক্ষেও তাঁহাকে মোহিত করিবার প্রশ্ন উঠিতে পারে না। ভগবানের অনুভব লাভের সৌভাগ্য যাহাদের হইয়াছে, তাঁহাদের উপরেই যখন মায়া কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, তখন ভগবানের উপর যে তাহার কোনও প্রভাবই থাকিতে পারে না, একথা বলাই বাহুল্য। ভগবান্ মায়ার অতীত; ভগবানের বহির্দেশেই মায়ার আত্মপ্রকাশ।

যাহারা মনে করেন, ঈশ্বরের দেহ মাযিক সত্ত্বগুণময়, তাঁহাদের উক্তির যে কোনও মূল্যই নাই, তাহাও ইহাদ্বারা সূচিত হইল।

যাহা হউক, মায়ার উল্লিখিত লক্ষণ দুইটি স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জগু আলোচ্য শ্লোকে দুইটি দৃষ্টান্তের অবতারণা করা হইয়াছে—যথাভাসঃ, যথা তমঃ। যথাভাসঃ=যথা+আভাসঃ।

যথা আভাসঃ—যেমন আভাস। আভাস—উজ্জ্বলিত প্রতিচ্ছবি। যেমন—আকাশস্থ সূর্যের প্রতিচ্ছবি পৃথিবীস্থ জলে দেখা যায়; জলস্থিত প্রতিচ্ছবিই আভাস। সূর্যের এই প্রতিচ্ছবি সূর্য হইতে দূরে প্রকাশমান-সূর্যের বহির্ভাগেই অবস্থিত থাকে; সূর্য থাকে আকাশে, আর প্রতিচ্ছবি থাকে পৃথিবীতে। তদ্রূপ, মায়াও শ্রীভগবানের সর্বিশেষ অভিব্যক্তি স্থানের বহির্ভাগে থাকে। (অর্থং ঋতে যং প্রতীয়েত)। ভগবানের সর্বিশেষ অভিব্যক্তি-স্থান—পরব্যোমাদি চিন্ময় ধাম; আর মায়ার অভিব্যক্তি স্থান—প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড। আবার প্রতিচ্ছবি যেমন সূর্যকে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশিত হয়, সূর্য আকাশে উদ্ভিত হইয়া কিরণ-জাল বিস্তার করিলেই যেমন প্রতিচ্ছবির উদ্ভব হয়, সূর্য কিরণ-জাল বিস্তার না করিলে যেমন পৃথিবীস্থ জলে তাহার প্রতিচ্ছবি দৃষ্ট হয় না (যেমন রাত্রিতে, কি মেঘাচ্ছন্ন দিবসে); তদ্রূপ, মায়াও শ্রীভগবান্কে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশিত হয়। শ্রীভগবান্ যখন তাঁহার (সৃষ্টিকারিণী) শক্তির বিকাশ করেন, তখনই মায়ার আত্মপ্রকাশ; আর যখন তিনি এই শক্তি বিকাশ করেন না (যেমন মহাপ্রলয়ে), তখন মায়ার অভিব্যক্তি থাকে না। প্রতিচ্ছবির যেমন স্বতঃপ্রকাশ নাই, মায়ারও তেমনি স্বতঃপ্রকাশ নাই। “ন প্রতীয়েত আত্মনি।”

আভাসের দৃষ্টান্তে বিশেষ করিয়া জীবমায়াকে বুঝাইতেছে বলিয়া মনে হয়। প্রতিচ্ছবিটা উজ্জল চাকচিক্যময়। অপলক দৃষ্টিতে ইহার প্রতি চাহিয়া থাকিলে ইহার উজ্জলতা ও চাকচিক্য বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া মনে হয়। আরও চাহিয়া থাকিলে মনে হয় যেন, ঐ প্রতিচ্ছবিতে নীল, পীত, লোহিতাদি নানা বর্ণ খেলা করিতেছে। প্রতিচ্ছবির কিরণচ্ছটায় দৃষ্টিশক্তি যখন প্রায় প্রতিহত হইয়া যায়, তখন ইহাও মনে হয়, যেন ঐ সমস্ত বিবিধ বর্ণ একত্র হইয়া (বর্ণশাবল্য প্রাপ্ত হইয়া) অন্ধকাররূপে পরিণত হইয়াছে। এই অন্ধকারের মধ্যেও আবার মাঝে মাঝে নীল-পীতাদি বিবিধ বর্ণ-রেখা পরিলক্ষিত হয়। প্রতিচ্ছবির কিরণচ্ছটায় যেমন দর্শকের দৃষ্টিশক্তি প্রতিহত বা আবৃত হইয়া যায় এবং অন্ধকার বা বর্ণের খেলা পরিলক্ষিত হয়; তদ্রূপ জীবমায়ার প্রভাবেও বহির্গুণ জীবের স্বরূপজ্ঞান আবৃত হইয়া যায় এবং সত্ত্বাদি গুণসাম্যরূপা গুণমায়া—কখনও বা পৃথগ্ভূত সত্ত্বাদিগুণও—নানাবিধ ভোগ্যবস্তুরূপে জীবের সাক্ষাতে প্রকটিত হয়। জীবমায়া এসমস্ত ভোগ্যবস্তুরূপে জীবের মমত্ববুদ্ধি জন্মায়। এই দৃষ্টান্ত হইতে ইহাও বুঝা যাইতেছে যে, প্রতিচ্ছবির কিরণচ্ছটা যেমন তাহার নিজস্ব নহে, পরস্তু আকাশস্থ সূর্য্য হইতেই প্রাপ্ত; তদ্রূপ, জীবমায়ার শক্তি—যদ্বারা বহির্গুণ জীবের স্বরূপ-জ্ঞান আবৃত হয় এবং মায়িক ভোগ্যবস্তুতে তাহার আসক্তি জন্মে, তাহাও—জীবমায়ার নিজস্ব নহে, পরস্তু তাহা শ্রীভগবান্ হইতেই প্রাপ্ত।

তারপর যথা তমঃ—অন্ধকার যেমন আলোকের বহির্ভাগে, আলোক হইতে দূরদেশেই প্রতীত হয়, যে স্থানে আলোক, সে স্থানে যেমন অন্ধকার প্রতীত হয় না; তদ্রূপ মায়াও শ্রীভগবানের সবিশেষ অভিব্যক্তি-স্থানের বহির্ভাগেই প্রকাশ পায়, ভগবানের অভিব্যক্তি-স্থানে মায়ার প্রকাশ নাই (অর্থঃ ঋতে যৎ প্রতীয়েত)। আবার যে স্থানে জ্যোতিঃ (আলোক), সে স্থানে অন্ধকার প্রকাশ না পাইলেও জ্যোতিঃ ব্যতীত অন্ধকারের প্রতীতি হয় না। অন্ধকারের অনুভব হয় চক্ষুঃদ্বারা। চক্ষুঃ হইল জ্যোতিরাত্মক ইন্দ্রিয়। হস্তপদাদি যে সমস্ত ইন্দ্রিয় জ্যোতিরাত্মক নহে, সে সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা অন্ধকারের অনুভব হয় না। সুতরাং জ্যোতির আশ্রয়েই অন্ধকারের প্রতীতি; জ্যোতির সাহায্য ব্যতীত অন্ধকার নিজে নিজের প্রতীতি জন্মাইতে পারে না। তদ্রূপ শ্রীভগবানের আশ্রয়েই মায়ার অভিব্যক্তি, ভগবানের আশ্রয় ব্যতীত, তাহার শক্তিব্যতীত, মায়া নিজেকে নিজে প্রকাশ করিতে পারে না। “যথাক্ষকারো জ্যোতিষোহমৃত্র এব প্রতীয়েত, জ্যোতির্বিদ্যা চ ন প্রতীয়েত, জ্যোতিরাত্মনা চক্ষুর্বেব তৎপ্রতীতে ন পৃষ্ঠাদিনেতি, তথেষমপীত্যেবং জ্ঞেয়ম্ ॥ ভগবৎ-সন্দর্ভঃ। ১৮ ॥” ইহা গেল শ্লোকস্থ “ন প্রতীয়েত চাত্মনি”—অংশের দৃষ্টান্ত।

অন্ধকারের দৃষ্টান্তে বিশেষভাবে যেন গুণমায়াকেই বুঝাইতেছে। শ্লোকস্থ তমঃ-শব্দে পূর্ব্বকথিত প্রতিচ্ছবির অন্ধকারময় (বর্ণশাবল্যময়) অবস্থাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। গুণমায়া এই বর্ণশাবল্যময় অবস্থার অনুরূপ। এই অন্ধকার আকাশস্থ সূর্য্যে নাই; সূর্য্যের বহির্দেশেই ইহার অবস্থিতি। তদ্রূপ গুণমায়াও শ্রীভগবানের সবিশেষ অভিব্যক্তি-স্থানে নাই; তাহার বহির্দেশেই গুণমায়ার প্রতীতি (অর্থঃ ঋতে যৎ প্রতীয়েত)। আবার সূর্য্য কিরণজাল বিস্তার না করিলে যেমন প্রতিচ্ছবি জন্মে না—সুতরাং প্রতিচ্ছবিস্থ বর্ণশাবল্যময় অন্ধকারেরও প্রতীতি হয় না; তদ্রূপ শ্রীভগবান তাহার শক্তিবিকাশ না করিলে গুণমায়ারও অভিব্যক্তি বা পরিণতি হয় না (ন প্রতীয়েত চাত্মনি)। ইহাতেই বুঝা গেল, শ্রীভগবানের আশ্রয় ব্যতীত—শ্রীভগবানের শক্তি ব্যতীত—গুণমায়াও পরিণতি প্রাপ্ত হইতে পারে না। স্বতঃ-পরিণাম-প্রাপ্তির সামর্থ্য গুণমায়ার নাই।

আভাস এবং তমঃ-এর দৃষ্টান্তের আর একটা ব্যঞ্জনা এই যে, প্রতিচ্ছবি বা তদন্তর্গত অন্ধকারের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ রাখিলে যেমন সূর্য্যকে দেখিতে পাওয়া যায় না, সূর্য্যকে দেখিতে হইলে যেমন প্রতিচ্ছবি হইতে দৃষ্টি উঠাইয়া সূর্য্যের দিকে চাহিতে হয়; তদ্রূপ মায়াবিষ্ট হইয়া থাকিলে—অর্থাৎ দেহেতে আত্মবুদ্ধি এবং ভোগ্যবস্তুতে আসক্তি থাকিলেও—কেহ ভগবদনুভূতি লাভ করিতে পারে না; দেহাত্মবুদ্ধি দূর হইয়া গেলেই তাহার অনুভূতি

সম্ভব। প্রতিচ্ছবি সূর্য্য নয়; তদ্রূপ মায়াও—মায়া হইতে জাত এই ব্রহ্মাণ্ড এবং তদন্তর্গত ভোগ্যবস্তু-আদিও—পরমার্থভূত বস্তু নয়। এইরূপেই এই শ্লোকে ব্যতিরেকীমুখে ভগবানের স্বরূপ-জ্ঞাপন।

এই শ্লোকে আরও কয়েকটা বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথমতঃ, সৃষ্টি করার ইচ্ছা হওয়ায় ভগবান্ যে মায়ার প্রতি দৃষ্টি করিলেন, সেই মায়া মিথ্যা বস্তু নহে, ভ্রান্তিবিলাসিত কোনও একটা বস্তু নহে; যেহেতু, জ্ঞানস্বরূপ ভগবানের পক্ষে ভ্রান্তি সম্ভব নয়। মায়া সত্য। ভগবান্ সত্য, তাঁহার দৃষ্টি সত্য, তাঁহার শক্তিও সত্য। মায়া ও ভগবানের শক্তির যোগে যে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাও সত্য; তাহা কখনও মিথ্যা হইতে পারেনা। ব্যষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির পরে ভগবান্ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামিকরূপে প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিলেন। শ্রুতিও একথা বলেন। “তং সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাविशत्।” তাঁহার প্রবেশ যেমন মিথ্যা নয়, যাহাতে তিনি প্রবেশ করিলেন, তাহাও মিথ্যা নয়। মিথ্যাজ্ঞান ভগবদবহির্ন্থ জীবেরই হইতে পারে, শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব ভগবানের হইতে পারেনা। আবার, ব্যষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির পরেই ব্যষ্টিজীবের সৃষ্টি এবং ব্যষ্টি-জীবের মোহনের জন্মই জীবমায়ায় প্রকাশ—ব্যষ্টিজীব-সৃষ্টির পরে। যখন ব্যষ্টি-জীবের সৃষ্টি হয় নাই, ব্যষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের মাত্র সৃষ্টি হইয়াছে, তখন জীবমায়ায় কার্য্যও আরম্ভ হয় নাই—বিষয়ের অভাবে। তখন কেবল গুণমায়াই অভিব্যক্তি, গুণমায়াতে মোহিনী শক্তির বিকাশ নাই। জীবমায়া গুণাতীত ভগবানকে মোহিত করিতে পারেনা বলিয়া তখন জীবমায়ায়ও বিকাশ নাই। সুতরাং তখন কোনও ভ্রান্তির অবকাশই থাকিতে পারে না। যে জগৎ সত্যসত্যই সৃষ্টি হইয়াছে, সেই জগৎও সত্য—তবে মায়িক বলিয়া অনিত্য। সুতরাং যাহারা বলেন—জগৎ মিথ্যা, তাঁহাদের উক্তির কোনও মূল্যই থাকিতে পারেনা। সম্ভবতঃ গুণমায়ায় প্রতি তাঁহাদের লক্ষ্য নাই বলিয়াই তাঁহারা ঐরূপ বলিয়া থাকেন। দ্বিতীয়তঃ, জীব যে ভোগায়তন দেহ পায়, তাহা গুণমায়াসম্ভূত, সুতরাং জড়। আর জীব হইল স্বরূপতঃ চিদবস্তু—দেহ হইতে ভিন্নজাতীয় বস্তু। সুতরাং জীবের ভোগায়তন দেহ তাহার আত্মা হইতে পারেনা। কিন্তু জীবমায়ায় প্রভাবে জীব দেহকেই আত্মা বলিয়া মনে করে। জীবমায়া মিথ্যা না হইলেও জীবমায়া-জনিত দেহে-আত্মবুদ্ধি মিথ্যা—বিবর্ত্ত। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—“দেহে আত্মবুদ্ধি—এই বিবর্ত্তের স্থান।”

যাহা হউক, চতুঃশ্লোকীয় প্রথম দুই শ্লোকে প্রণবোক্ত পরব্রহ্মের স্বরূপ, অন্বয়ী ও ব্যতিরেকীমুখে, প্রকাশ করা হইল। তিনি জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ, তিনিই সম্বন্ধ-তত্ত্ব। তাই এই দুই শ্লোকে প্রণবোক্ত সৃষ্টি-সম্বন্ধ-তত্ত্বের কথাও বিশেষভাবে বিবৃত হইল।

উক্ত দৃষ্টান্তে সূর্য্যকে ভগবান্ বা ব্রহ্মের সঙ্গে এবং সূর্য্যের প্রতিচ্ছবি বা প্রতিবিম্বকে মায়ায় সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। ইহাতে যদি কেহ মনে করেন যে, মায়িক জগৎও ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব, তবে তাহা সঙ্গত হইবে না। কারণ, সূর্য্যের জ্বালায় কোনও পরিচ্ছিন্ন বস্তুরই প্রতিবিম্ব সম্ভব, সর্বব্যাপক অপরিচ্ছিন্ন বস্তুর প্রতিবিম্ব সম্ভব নয়। ব্রহ্ম হইলেন সর্বব্যাপক অপরিচ্ছিন্ন বস্তু; ব্রহ্মের কোনও প্রতিবিম্ব হইতে পারেনা। ইহা দ্বারা প্রতিবিম্ববাদও নিরস্তু হইল। সূর্য্য ও প্রতিচ্ছবির দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে—কেবলমাত্র মায়ায় পূর্ব্বোল্লিখিত লক্ষণ দুইটাকে পরিস্ফুট করার উদ্দেশ্যে, অন্য কোনও উদ্দেশ্যে নহে।

জগতিস্থ জীব ব্রহ্মের সহিত তাহার সম্বন্ধের জ্ঞান—সুতরাং নিজের স্বরূপের জ্ঞানও—হারাইয়াছে, ইহা প্রণবের অর্থ হইতে বুঝা যায়; কিন্তু কেন হারাইয়াছে, তাহা প্রণবের অর্থ হইতে জানা যায় না। গায়ত্রীর “ভর্গ”-শব্দের ব্যঞ্জনায়া মায়াকে অপসারিত করার কথা জানা যায়; তাহাতে অনুমানমাত্র হয় যে, মায়াই বোধ হয় সম্বন্ধজ্ঞান-বিস্মৃতির হেতু। গীতা হইতে জানা যায়, মায়াই জীবকে সংসারে ঘুরাইতেছে। এই শ্লোক হইতে পরিষ্কারভাবে জানা গেল—জীবমায়াই আমাদের স্বরূপের জ্ঞানকে—সুতরাং ভগবানের সহিত সম্বন্ধের জ্ঞানকেও—ভুলাইয়া রাখিয়াছে এবং আমাদের দেহাত্মবুদ্ধি জন্মাইয়া এবং ভোগ্যবস্তুতে আসক্তি জন্মাইয়া সংসারে ঘুরাইতেছে। এইরূপে প্রণবোক্ত উপাসনার হেতু এবং সম্বন্ধজ্ঞান-বিস্মৃতির হেতুও এই শ্লোক হইতে স্পষ্টরূপে জানা গেল। তাই এই শ্লোকটীও প্রণবের অর্থ-প্রকাশক।

এক্ষণে চতুঃশ্লোকীর তৃতীয় শ্লোকের আলোচনা করা যাইতেছে। তৃতীয় শ্লোকটি এই।

যথা মহাস্তি ভূতানি ভূতেষু চাভিচেৎসু।

প্রবিষ্টাণ্ডপ্রবিষ্টানি তথা তেষু নতেষহম্ ॥ শ্রীভা, ২।২।৩৪ ॥

ভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিলেন—(আকাশাদি) মহাভূতসকল যেমন দেব-মহুগ্ধাদি সর্ববিধ প্রাণীর ভিতরে ও বাহিরে অবস্থিত, তদ্রূপ আমিও আমার চরণে প্রণত ভক্তগণের ভিতরে ও বাহিরে অবস্থিত।

পূর্ববর্তী “জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে”—ইত্যাদি শ্লোকে যে রহস্যের উল্লেখ আছে, সেই রহস্যের (পরম গুহ্যতম বস্তু) কথাই এই শ্লোকে বলা হইতেছে। ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম (আকাশ)—এই পাঁচটি মহাভূত। জীবের দেহ এই পাঁচটি মহাভূতে গঠিত। এই পাঁচটি মহাভূত দেহরূপেও জীবের মধ্যে আছে, পৃথক পৃথক ভাবেও জীবের দেহে বর্তমান। আবার, দেহের বাহিরেও ইহার সর্বত্র আছে। এইরূপে এই পাঁচটি মহাভূত জীবের ভিতরেও আছে, বাহিরেও আছে। তদ্রূপ ভগবান্ও অন্তর্যামিরূপে প্রত্যেক জীবের মধ্যেও আছেন, আবার বাহিরে তাঁহার পরব্যোমাদি ধামেও আছেন। এইরূপে ভগবান্ও সকল জীবের ভিতরে এবং বাহিরেও বিদ্যমান। কিন্তু একথা বলাই এই শ্লোকের উদ্দেশ্য নহে; কারণ, এই কথার মধ্যে রহস্য কিছু নাই; ইহা অতি সাধারণ কথা। একটু বিশেষ রকমে “ভিতরে ও বাহিরে” ভগবানের থাকার কথাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। ইহাই রহস্য। এই রহস্য নিহিত রহিয়াছে “তেষু নতেষু অহম্”—বাক্যে। নতেষু অর্থ—প্রণতেষু; যাহারা ভগবচ্চরণে প্রণত, সমস্ত ত্যাগ করিয়া—গীতার কথায় বলিতে গেলে “সর্কধর্মান্ পরিত্যজ্য”—যাহারা ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন এবং ভগবৎ-সেবাকেই একমাত্র কর্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেই এস্থলে ‘নত’ বলা হইয়াছে। “তেষু নতেষু—সেই প্রণত-জনগণের মধ্যে”—এই বাক্যের “তেষু”—শব্দের একটা বিশেষ বাঞ্ছনা আছে। ব্রহ্মার নিকটে রহস্যটা প্রকাশ করিবার উপক্রমেই যেন শ্রীভগবানের মনে তাঁহার প্রিয়তম ভক্তদের কথা উদিত হইল; তিনি যেন মানস-নেত্রে তাঁহাদিগকে দেখিতেই পাইলেন। তাই যেন তাঁহাদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই বলিলেন—“তেষু নতেষু—আমার পরম-প্রিয়তম সেই ভক্তদের মধ্যে।” যাহাদের কথা তিনি ব্রহ্মাকে বলিলেন, তেযু-শব্দেই, ভগবানের পক্ষে তাঁহাদের পরম-প্রিয়তম স্বচিত হইতেছে। ভগবানের নিকটে এইরূপ প্রিয়তম হওয়া কেবলমাত্র প্রেমিক ভক্তদের—ভগবানের প্রীতি-সম্পাদন ব্যতীত অণু কিছু যাহারা জানেন না, তাঁহাদের—পক্ষেই সম্ভব। “তেষু নতেষু”—বাক্যাংশে এইরূপ প্রেমবান্ ভক্তদের কথাই বলা হইয়াছে। পঞ্চভূত যেমন প্রাণিমাত্রের ভিতরে এবং বাহিরে বর্তমান, শ্রীভগবান্ও, এইরূপ প্রেমিক-ভক্তদের ভিতরে এবং বাহিরে বর্তমান। ইহাদের ভিতরে তিনি অন্তর্যামিরূপে তো আছেনই, আরও এক বিশেষরূপে আছেন—তাঁহাদের প্রেমের বশীভূত হইয়া তিনি স্বয়ংরূপেও তাঁহাদের মধ্যে আছেন। তাই শ্রীভগবান্ দুর্কীসার নিকটে বলিয়াছেন—“স্বাধুভির্গ্ৰস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ।—ভক্তিই আমার প্রিয়, আমিও ভক্তদের প্রিয়। সাধুভক্তগণ (স্বস্থ-বাসনার এবং স্বদুঃখনিবৃত্তি-বাসনার গন্ধলেশও যাহাদের মধ্যে নাই, আমার প্রীতিবিধান ব্যতীত অণু কোনও বাসনাই যাহাদের মধ্যে নাই, তাঁহারাই সাধুভক্ত; তাঁহারা) তাঁহাদের হৃদয়ে আমাকে—যেই আমি তোমার সঙ্গে কথা বলিতেছি, সেই আমাকেই—আমার অন্তর্যামি-স্বরূপকে নহে—স্বয়ং আমাকেই তাঁহাদের হৃদয়ে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছেন। আমি পরম-স্বতন্ত্র হইলেও তাঁহাদের নিকটে আমার স্বাতন্ত্র্য নাই, আমি সর্বতোভাবে তাঁহাদের অধীন। অহং ভক্তপরাধীনো হৃদয়ঃ ইব দ্বিজ ॥ শ্রীভা, ২।৪।৬৩ ॥” এইরূপেই ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহার প্রিয়ভক্তদের ভিতরে—হৃদয়ে—অবস্থান করেন। আর তাঁহাদের বাহিরে—ভগবান্ তাঁহার স্বীয় ধামে তো থাকেনই, তদ্ব্যতীত—ভক্ত যখন তাঁহার দর্শন পাইতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি ভক্তের সাক্ষাতেও স্বীয় পরম-মধুর-রূপ প্রকটিত করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করেন। ভক্তের ভিতরে এবং বাহিরে তিনি কি ভাবে থাকেন, তাহার সংবাদটাই এই শ্লোকের ‘রহস্য’। পরম-রূপালু শ্রীভগবান্ ব্রহ্মার নিকটে সেই রহস্যতত্ত্বটাই প্রকাশ করিলেন।

এই শ্লোকে ভগবান্ প্রেমভক্তির রহস্যের কথাই ব্যক্ত করিলেন। ভগবৎ-সুখৈকতাংপর্যায় প্রেমের সহিত যে ভক্ত তাঁহার সেবা করেন, তিনি সর্বতোভাবে সেই ভক্তের বশীভূত হন—“ভক্তিবশঃ পুরুষঃ। ভক্তিরেব গরীয়সী ॥ শ্রুতি ॥”—একথাই ব্রহ্মাকে জানাইলেন।

গীতাবাক্যের তাৎপর্যো জানা গিয়াছে, জীব স্বরূপতঃ ভগবানের দাস; সুতরাং ভগবৎ-সেবাই তাহার স্বরূপানুবন্ধি কর্তব্য। কিন্তু প্রেমব্যতীত সেবা হইতে পারে না। তাই প্রেমই যে জীবের প্রয়োজন, এই শ্লোকে ভগবান্ তাহাই জানাইলেন।

প্রণবের অর্থ হইতে জানা গিয়াছে, প্রণবের উপাসনায় যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই পাওয়া যায়। “ব্রহ্মলোকে মহীয়ান্” হওয়ার কথাও প্রণবার্থে জানা গিয়াছে। অতঃ সমস্ত অপেক্ষা “ব্রহ্মলোকে মহীয়ান্” হওয়াই যে পরম-কাম্য, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু “ব্রহ্মলোকে—ভগবানের ধামে—মহীয়ান্” হওয়া যায় কেবল মাত্র প্রেমের সহিত ভগবানের সেবাদ্বারা; যেহেতু একরূপ সেবাদ্বারাই ভগবান্কে বশীভূত করা যায়। সুতরাং “যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তিনি তাহা পাইতে পারেন”—প্রণবার্থের অন্তর্গত এই “ইচ্ছার” মহীয়ান্ বিকাশও প্রেমপ্রাপ্তির ইচ্ছাতেই। সুতরাং প্রণবে যে প্রয়োজন-তত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে, তাহার চরম-তম বিকাশ প্রেমে। প্রণবোক্ত প্রয়োজন-তত্ত্বের গূঢ় তাৎপর্য্যই এই শ্লোকে প্রকাশ করা হইয়াছে।

ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধজ্ঞান স্ফূরিত হইলেই ভগবৎ-সেবার জন্ত বলবতী লালসা জন্মে; তখন ভগবান্ই রূপা করিয়া ভক্তকে প্রেম দেন এবং স্বচরণ-সেবা দিয়া কৃতার্থ করেন। গীতার উক্তি এবং পূর্ববর্তী “ঋতেহর্থঃ যৎ প্রতীয়েত”—ইত্যাদি শ্লোকের মর্ম্ম হইতে জানা গিয়াছে—মায়া দ্বারা কবলিত হওয়াতেই জীব সম্বন্ধজ্ঞান বিস্মৃত হইয়া আছে। কি উপায়ে সম্বন্ধজ্ঞান স্ফূরিত হইতে পারে, প্রেমলাভ হইতে পারে এবং মায়ার প্রভাবও অপসারিত হইতে পারে, তাহাই চতুঃশ্লোকীর শেষ শ্লোকে বলা হইয়াছে। শেষ শ্লোকটাই এখন আলোচিত হইতেছে।

এতাবদেব জিজ্ঞাস্তাং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাং।

অন্যব্যতিরেকাভ্যাং যং স্ত্রাং সর্বত্র সর্বদা ॥ শ্রীভা, ২।৩।৫॥

শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিলেন—যিনি আমার তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি যেন (শ্রীগুরুদেবের নিকটে) এমন বস্তুটির কথাই জিজ্ঞাসা করেন, অন্যথা ও ব্যতিরেকী মুখে শাস্ত্রে যাহার উপদেশ দৃষ্ট হয় এবং যাহা সর্বত্র সর্বদা সম্ভব হয়।

এই শ্লোকে তত্ত্বজিজ্ঞাসু অর্থে ভগবানের যথার্থ-অনুভব-লাভেচ্ছু বুঝায়। “তত্ত্বজিজ্ঞাসুনা যথার্থ্যমনুভবিতু-মিচ্ছুনা—ক্রমসন্দর্ভঃ।” ভগবানের যথার্থ-অনুভব-প্রাপ্তির উপায়টাই হইল একমাত্র জিজ্ঞাসার বস্তু—মুখ্য জিজ্ঞাস্তা।

এই শ্লোক বলিতেছেন—ভগবানের যথার্থ-অনুভবপ্রাপ্তির জন্ত এমন একটা উপায়ের কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, যাহা সকলের পক্ষে সকলস্থানে সকল সময়ে সর্বতোভাবে নিশ্চিত উপায় হইবে। নচেৎ সাধকের চেষ্টা পণ্ড্রমে পরিণত হইতে পারে, সকল লোক সাধনের সুযোগও না পাইতে পারে। সকলের পক্ষে কোনও উপায়ের এইভাবে নিশ্চয়তা নির্ধারণ করিতে হইলে এই কয়টি বিষয় দেখিতে হইবে :—

প্রথমতঃ, উপায়টি সম্বন্ধে শাস্ত্রে কোনও অন্য-বিধি আছে কিনা। অর্থাৎ এই উপায়টি অবলম্বন করিলে অভীষ্ট-সিদ্ধি হইবে, এমন কোনও প্রমাণ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় কিনা।

দ্বিতীয়তঃ, উপায়টি সম্বন্ধে কোনও ব্যতিরেক-বিধি আছে কিনা; অর্থাৎ এই উপায়টি অবলম্বন না করিলে অভীষ্ট-সিদ্ধি হইবে না, এমন কোনও প্রমাণ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় কিনা।

তৃতীয়তঃ, উপায়টি অগ্নিরপেক্ষ কিনা। অর্থাৎ অভীষ্ট-ফলদান-বিষয়ে এই উপায়টি অতঃ কিছু সাহচর্য্যের অপেক্ষা রাখে কিনা। যদি অতঃ বস্তুর সাহচর্য্যের অপেক্ষা থাকে, তাহা হইলে অপেক্ষণীয় বস্তুর অভাবে, কিংবা তাহার সাহচর্য্যের তারতম্যানুসারে, অভীষ্টলাভে বিঘ্ন জন্মিতে পারে।

যদি উপায়টী সম্বন্ধে অন্বয়-বিধি ও ব্যতিরেক-বিধি থাকে এবং যদি তাহা অণুনিরপেক্ষ হয়, তাহা হইলে উপায়টীর অভীষ্ট-ফলদানের সামর্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহের কিছু থাকেনা। তথাপি কিন্তু এই উপায়টী সকল লোক সকল স্থানে সকল সময়ে অবলম্বন করিতে পারিবে কিনা, তাহাও বিবেচনা করা দরকার। যদি দেশ-কাল-পাত্রাদির অপেক্ষা থাকে, তাহা হইলেও উপায়টী সকল লোকের, সকল সময়ের এবং সকল স্থানের অবলম্বনীয় নিশ্চিত উপায়রূপে পরিগণিত হইতে পারে না। তাই নিম্নলিখিত বিষয়গুলিও দেখিতে হইবে।

চতুর্থতঃ, উপায়টীর সার্বত্রিকতা আছে কিনা। অর্থাৎ উপায়টী সর্বত্র অবলম্বনীয় কিনা। সর্বত্র বলিতে—সকল লোকে, সকল স্থানে, সকল অবস্থায় বুঝায়। যে উপায়টী যে কোনও লোক, যে কোনও অবস্থায়, যে কোনও স্থানে অবলম্বন করিতে পারে, তাহারই সার্বত্রিকতা আছে বুঝিতে হইবে। সার্বত্রিকতা না থাকিলে দেশ, পাত্র ও অবস্থার প্রতিকূলতায় বা অনুকূলতার অভাবে অভীষ্ট-সিদ্ধিবিষয়ে বিঘ্ন জন্মিতে পারে। অবস্থা—দশা; বাল্য-যৌবনাদি, গুচি-অগুচি-আদি।

পঞ্চমতঃ, উপায়টীর সদাতনত্ব আছে কিনা। অর্থাৎ এই উপায়টী যে কোনও সময়ে অবলম্বন করা যায় কিনা। সদাতনত্ব না থাকিলে, সময়ের প্রতিকূলতায় বা অনুকূলতার অভাবে অভীষ্ট-সিদ্ধিবিষয়ে বিঘ্ন জন্মিতে পারে।

উল্লিখিত পাঁচটি লক্ষণ যে উপায়টীর থাকিবে, দেশ-কাল-পাত্র-দশা-নির্বিবশেষে তাহাকেই সর্বতোভাবে নিশ্চিত উপায় বলিয়া গ্রহণ করা যায়। তাই শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—“অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ সর্বত্র সর্বদা স্মৃত্যং, এতাবদেব জিজ্ঞাস্তুম্॥”

এক্ষণে দেখিতে হইবে, উক্ত পাঁচটি লক্ষণযুক্ত নিশ্চিত উপায়টী কি? কৰ্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি—মোটামুটি-ভাবে এই চারিটি উপায়ের কথাই শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। যথার্থ-ভগবদনুভব-প্রাপ্তির পক্ষে ইহাদের প্রত্যেকটীই সর্বতোভাবে নিশ্চিত উপায় কিনা, অথবা কোনটী নিশ্চিত উপায়, তাহাই নির্ণয় করিতে হইবে। এই ব্যাপারে আমাদের কাছে দেখিতে হইবে—এই উপায়-সম্বন্ধে উক্ত পাঁচটি লক্ষণ আছে কিনা। কোনও উপায়ে যদি প্রথম তিনটি লক্ষণের কোনও একটির অভাব দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে উপায়টীর অভীষ্ট-ফলদানের সামর্থ্যই অনিশ্চিত বলিয়া মনে করিতে হইবে এবং উপায়টীরও নিশ্চিততা প্রতিপন্ন হইবে না। কোনও উপায়ে যদি প্রথম তিনটি লক্ষণ থাকে, তাহা হইলে তাহার সামর্থ্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় বটে; কিন্তু তাহার সার্বত্রিকতা এবং সদাতনত্ব আছে কিনা, তাহাও দেখিতে হইবে। এই দুইটি লক্ষণ না থাকিলেও উপায়টীকে সকলের পক্ষে সর্বতোভাবে নিশ্চিত উপায় বলিয়া স্বীকার করা যাইবে না।

কৰ্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ—এই তিনটি উপায়ের প্রত্যেকটী সম্বন্ধেই অন্বয়-বিধি আছে; কিন্তু ব্যতিরেক-বিধি একটির সম্বন্ধেও নাই। বিশেষতঃ, এই তিনটি পন্থার একটীও অণু-নিরপেক্ষ নহে; প্রত্যেকটীই ভক্তির অপেক্ষা রাখে (অভিধেয়তত্ত্ব-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। ইহাদের কোনওটির সার্বত্রিকতাও নাই, সদাতনত্বও নাই (আদি লীলার প্রথম পরিচ্ছেদে ২৬শ শ্লোকের টীকায় বিশেষ আলোচনা দ্রষ্টব্য)। কাজেই এই তিনটি উপায় ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে নিশ্চিত উপায় হইলেও দেশ-কাল-পাত্র-দশা-নির্বিবশেষে নিশ্চিত উপায় নয়। বিশেষতঃ, এসমস্ত উপায়ে ভগবানের যে অনুভব লাভ হয়, তাহাকেও যথার্থ-অনুভব বলা চলে না। কৰ্ম্মমার্গ কোনও পরমার্থ-বস্তুই দান করিতে পারে না, ভগবদনুভব তো দূরের কথা। জ্ঞানমার্গ ও যোগমার্গ ভক্তির সাহচর্যে অনুসৃত হইলে যথাক্রমে নির্বিশেষ-ব্রহ্মসামুদ্র্য এবং পরমায়ার সহিত সংযোগ দিতে পারে। কিন্তু তাহাতে জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধের জ্ঞান—সুতরাং সেবা-সেবক-ভাবও—ক্ষুরিত হইতে পারে না। সম্বন্ধের জ্ঞান ক্ষুরিত হইলেই প্রেমের সহিত ভগবৎ-সেবা করিয়া জীব ভগবানের যথার্থ অনুভব—তিনি আনন্দ-স্বরূপ, রূপ-স্বরূপ, সমস্ত আনন্দবৈচিত্রী ও রসবৈচিত্রী যে তাঁহাতে বর্ত্তমান, এসমস্তের অনুভব—লাভ করিতে পারে। জ্ঞানমার্গে বা যোগমার্গে তাহা অসম্ভব। বিশেষতঃ পূর্বশ্লোকে প্রয়োজন-তত্ত্বরূপে যে প্রেমের কথা বলা হইয়াছে, যোগমার্গের বা জ্ঞানমার্গের সাধনে তাহা দুর্লভ।

সুতরাং কৰ্ম, জ্ঞান বা যোগ—ইহাদের কোনওটাই দেশ-কাল-পাত্র-দশা-নির্বিশেষে সৰ্বতোভাবে নির্ভরযোগ্য নিশ্চিত পন্থা নহে।

ভক্তিসম্বন্ধে অর্থবিধি এবং ব্যতিরেকী বিধি—উভয়ই শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। ভক্তি পরম-স্বতন্ত্র বলিয়া অগ্র-নিরপেক্ষও। “ভক্তিরেব এনং নয়তি। ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি। ভক্তিবশঃ পুরুষঃ। ভক্তিরেব গরীয়সী ॥ মার্গ-শ্রুতিঃ ॥” ভক্তির সার্বত্রিকতা এবং সদানুভূতি আছে। যে কোনও লোক যে কোনও অবস্থায়, যে কোনও স্থানে, যে কোনও সময়ে ভক্তিমার্গের অনুষ্ঠানে অধিকারী। (বিস্তৃত আলোচনা ও শাস্ত্রপ্রমাণাদি আদিলীলার প্রথম পরিচ্ছেদে ২৬শ শ্লোকের টীকায় দ্রষ্টব্য)। যথার্থ-ভগবদভূতবের পক্ষে যে প্রেম অপরিহার্য, একমাত্র ভক্তিমার্গের সাধনই তাহা সুলভ। সুতরাং যথার্থ ভগবদভূতবের পক্ষে দেশ-কাল-পাত্র-দশা-নির্বিশেষে ভক্তিমার্গের সাধনই সৰ্বতোভাবে নির্ভরযোগ্য নিশ্চিত পন্থা।

“জ্ঞানং পরমগুহং মে”—ইত্যাদি শ্লোকে “তদঙ্গক”—পদে ভগবৎ-স্বরূপজ্ঞানের অঙ্গস্বরূপ যে সাধনের কথা বলা হইয়াছে, এই শ্লোকে তাহার পরিচয় দেওয়া হইল। এই শ্লোকে দেখান হইল—সাধন-ভক্তিই অভিধেয়-তত্ত্ব।

প্রণবের অর্থে যে উপাসনার কথা এবং গায়ত্রীতে যে ধ্যানের কথা বলা হইয়াছে, চতুঃশ্লোকীর এই শেষ-শ্লোকে দেখান হইল—তাহার পর্য্যবসান সাধন-ভক্তিতে।

এইরূপে দেখান হইল—চতুঃশ্লোকীতে প্রণবের অর্থ বিবৃত করিয়া বলা হইয়াছে এবং প্রণব বা গায়ত্রীতে যে সঙ্গ, অভিধেয় এবং প্রয়োজন তত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে, এই চতুঃশ্লোকীতে তাহাদেরও বিশেষ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে—“অহমেবাসমেবাগ্রে”—ইত্যাদিশ্লোকে অর্থীমুখে এবং “ঋতেহর্থং যং”—ইত্যাদি শ্লোকে ব্যতিরেকীমুখে সঙ্গতত্ত্বের, “এতাবদেব জিজ্ঞাস্তুম্”—ইত্যাদি শ্লোকে অভিধেয়তত্ত্বের এবং যথা মহাস্তি ভূতানি—ইত্যাদি শ্লোকে প্রয়োজনতত্ত্বের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

প্রণবরূপ বীজ চতুঃশ্লোকীতেই শাখাপত্রপুষ্পসমন্বিত রূপে পরিণত হইয়াছে।

ব্রহ্মা যে চারিটি বস্তু জানিতে চাহিয়াছিলেন, এই চতুঃশ্লোকীতে ভগবান্ তাহাও জানাইলেন। “অহমেবাসমেবাগ্রে”—ইত্যাদি শ্লোকে ভগবানের স্মৃতি ও স্থলরূপ এবং মায়ার সহযোগে তাহার লীলাতত্ত্ব, “ঋতেহর্থং”—ইত্যাদি শ্লোকে মায়ার স্বরূপ এবং “যথা মহাস্তি ভূতানি”—ইত্যাদি এবং “এতাবদেব জিজ্ঞাস্তুম্”—ইত্যাদি শ্লোকে তত্ত্বজ্ঞান জন্মবার উপায়ের কথা জানান হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে প্রণবের অর্থ বিকাশ। শ্রীমদ্ভাগবত হইতেছে চতুঃশ্লোকীরই বিবৃতি। সুতরাং প্রণব বা গায়ত্রীর অর্থ চতুঃশ্লোকীতে যতদূর বিকাশ লাভ করিয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবতে তদপেক্ষাও অধিকরূপে উজ্জলতর বিকাশ লাভ করিয়াছে।

পূর্বে গুরুপুত্রাণের বচন উদ্ধৃত করিয়া বলা হইয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবত গায়ত্রীর ভাষ্যসদৃশ; সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত প্রণবেরও ভাষ্যস্বরূপ; যেহেতু, “প্রণবের যেই অর্থ, গায়ত্রীতে সেই হয় ॥ ২।২।৫।৭৮ ॥” বস্তুতঃ, শ্রীমদ্ভাগবতের আরম্ভই গায়ত্রীর অর্থ-প্রকাশে। “গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ-আরম্ভণ। সত্যং পরং—সঙ্গ, ধীমহি—সাধন-প্রয়োজন ॥ ২।২।৫।১০২ ॥” শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকটি আলোচনা করিলেই তাহা বুঝা যাইবে। প্রথম শ্লোকটি এই।

অন্যাত্ম যতোহন্যাদিতরতশ্চার্থেধভিজ্ঞঃ স্বরাট্

তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহুস্তি যং সুরয়ঃ।

তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গো মৃদা

ধাম্মা স্নেন সদা নিরন্তকূহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥

মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে ৫১ শ্লোকের টীকায় এই শ্লোকের বিবৃতি দ্রষ্টব্য। শ্লোকটির মোটামোটি অর্থ এইঃ—যিনি জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা, যিনি সর্বজ্ঞ এবং স্বরাট্, যিনি ব্রহ্মাতে বেদ বিস্তার করিয়াছেন,

যিনি স্বীয় তেজোদ্বারা (স্বরূপশক্তি দ্বারা) সর্বদা মায়াকে নিরস্ত করিতেছেন, যিনি পর—সর্বশ্রেষ্ঠতত্ত্ব, সেই সত্যস্বরূপকে ধ্যান করি।

এই শ্লোকে যে গায়ত্রীর অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে, সংক্ষেপে তাহা দেখান হইতেছে।

গায়ত্রী-মন্ত্রটি এই। তৎসবিতুঃ বরেণ্যঃ ভর্গোদেবশ্চ ধীমহি ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ—যিনি আমাদের বুদ্ধির প্রেরয়িতা, সেই সবিতা দেবের সর্ব-বরণীয়-ভর্গকে (তেজকে) ধ্যান করি।

গায়ত্রীর “সবিতুঃ”-(সবিতার, জগৎ-প্রসবিতার)-শব্দের অর্থ প্রকাশ পাইতেছে, শ্লোকস্থ “জন্মাদস্ত যতঃ” (যাহা হইতে জগতের জন্মাদি, যিনি জগতের প্রসবিতা)-বাক্যে।

গায়ত্রীর “দেবশ্চ”-(যিনি দেবতা—লীলাপরায়ণ, তাঁহার)-শব্দের অর্থ প্রকাশ পাইতেছে শ্লোকস্থ “স্বরাট্”-শব্দে। স্বরাট্ অর্থ—সৈঃ গোকুলবাসিভিরেব রাজতে (ক্রমসন্দর্ভঃ) ; যিনি স্বীয় পরিকরবর্গের সহিত লীলাপরায়ণ।

গায়ত্রীর “ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ—যিনি আমাদের বুদ্ধির প্রেরক”-বাক্যের অর্থ প্রকাশ পাইতেছে শ্লোকস্থ “তেনে ব্রহ্ম (বেদ) হৃদা য আদিকবয়ে—যিনি আদি কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন”—এই বাক্যে ; যিনি সমষ্টিজীব-স্বরূপ ব্রহ্মারও বুদ্ধি-প্রেরক।

গায়ত্রীর “বরেণ্যঃ—বরণীয়, সকলের ভজনীয়”-শব্দের অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে শ্লোকস্থ “পরম্”—মন্ত্রে বরেণ্য-শব্দেনাত্ৰ চ গ্রন্থে পরশব্দেন পারমৈশ্বর্যপর্যন্ততা দর্শিতত্বাৎ (ক্রমসন্দর্ভঃ)। গায়ত্রীর বরেণ্য-শব্দ এবং শ্রীমদ্ভাগবতের পর-শব্দ ব্রহ্মের ভর্গের বা তেজের পারমৈশ্বর্যতাপর্যন্ত সূচনা করিতেছে। (বরেণ্য-শব্দ গায়ত্রীর ভর্গের বিশেষণ)। ব্রহ্মের ভর্গ বা তেজ—শক্তি—ব্রহ্মের পারমৈশ্বর্য পর্যন্ত বিকাশ লাভ করিয়াছে, ইহাই গায়ত্রীর বরেণ্য এবং শ্লোকস্থ পর-শব্দের তাৎপর্য। সুতরাং বরেণ্য ও পর—উভয়ের তাৎপর্যই এক।

গায়ত্রীর “ভর্গঃ—অবিষ্টাকে অপসারিত করিতে পারে, (ব্রহ্মের) এইরূপ শক্তি বা তেজ”-শব্দের তাৎপর্য শ্লোকস্থ “ধাম্মা সেন সদা নিরন্তকুহকম্—যিনি স্বীয় তেজ বা শক্তিদ্বারা সর্বদা মায়াকে নিরস্ত করেন”—এই বাক্যে প্রকাশিত হইয়াছে।

গায়ত্রীর “ভর্গঃ ধীমহি—ব্রহ্মের সেই তেজের—সেই অবিষ্টা-ধ্বংসকর-তেজঃসমন্বিত ব্রহ্মের—ধ্যান করি”-বাক্যের অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে শ্লোকস্থ “সতাং ধীমহি—সেই সত্যস্বরূপ—সতাং জ্ঞানমনন্তঃ ব্রহ্ম-বাক্যে প্রাপ্তি যে ব্রহ্মের কথা বলিয়াছেন এবং যিনি স্বীয় তেজোদ্বারা মায়াকে নিরস্ত করেন, সেই সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের ধ্যান করি”—এই বাক্যে।

এইরূপে দেখা গেল, গায়ত্রীর যাহা তাৎপর্য, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকেরও তাহাই তাৎপর্য। গায়ত্রীতে যেমন সম্বন্ধ-তত্ত্ব (সবিতা), অভিধেয়তত্ত্ব (ধীমহি) এবং প্রয়োজনতত্ত্বের (মায়া-নিরসনের) কথা আছে, এই শ্লোকেও তাহা আছে। “সত্যম্”—শব্দে সম্বন্ধতত্ত্বের স্বরূপলক্ষণ এবং “জন্মাদস্ত যতঃ”—বাক্যে তাঁহার তটস্থ লক্ষণ, “ধীমহি”—শব্দে অভিধেয়-তত্ত্ব এবং “ধাম্মা সেন নিরন্তকুহকম্”—বাক্যে প্রয়োজন-তত্ত্বের কথা শ্লোকে প্রকাশ করা হইয়াছে। এতদুই বলা হইয়াছে—“গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ-আরম্ভণ।”

যাহা হউক, শ্রীমদ্ভাগবতে প্রণবের বা গায়ত্রীর অর্থ কিরূপে বিবৃত হইয়াছে, তাহা দেখা-যাউক।

প্রথমতঃ সম্বন্ধতত্ত্বের কথা। প্রণবে সম্বন্ধতত্ত্ব—ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম। অপর-ব্রহ্মও তাঁহার বিকাশ।

অপর-ব্রহ্মের পরিচয়ঃ—প্রণবে ইদম্ বা এতৎ ; গায়ত্রীতে ব্যাহতিতে, ভূভুবাদি সপ্তলোক ; চতুশ্লোকীতে স্থল, সূক্ষ্মজগৎ, প্রধান ; সদসংপরম্। শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্দশভুবন—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্য—এই সপ্তলোক এবং পাতাল, রসাতল, মহাতল, তলাতল, সূতল, বিতল, অতল,—এই সপ্তপাতাল (শ্রীভা, ২।১।২৬২৮)। চতুর্দশভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ড। ইহাতেই প্রণবের অপর-ব্রহ্ম-রূপের বিকাশের পূর্ণতা।

পরব্রহ্মের পরিচয়ঃ—প্রণবে সর্বব্যাপক, কালাতীত, সর্বজ্ঞ, সর্ববিন্য়, সর্বেশ্বর, অন্তর্যামী, সর্বযোনি, জগৎ-কারণ ; সবিশেষ। গায়ত্রীতে—জগৎ-কারণ, বুদ্ধির প্রেরক, মায়া-নিরসনকারী-তেজঃসম্পন্ন, অন্তর্যামী। গায়ত্রী-

শিরোভাগে আপঃ (সর্বব্যাপক), জ্যোতিঃ (স্বপ্রকাশ, চিদ্রূপ), রসঃ (পরম-আস্বাদ এবং পরম-আস্বাদক), অমৃতম্ (মায়ানিমুক্ত, শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত-স্বভাব) এবং ব্রহ্ম (স্বরূপে, শক্তিতে, শক্তির কার্যে, শক্তিকার্যের বৈচিত্রীতে—সর্ববিষয়ে সর্ববৃহত্তম তত্ত্ব) । গীতায়—শ্রীকৃষ্ণ প্রণব, পরব্রহ্ম, অবতারী, মায়ায় নিয়ন্তা, তাঁহার প্রকাশবিশেষ—বিশ্বরূপ, অব্যক্তশক্তিক ব্রহ্ম । চতুঃশ্লোকীতে শ্রীমদ্ভাগবতে—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপের মূল, অবতারী । গায়ত্রীর শিরোভাগস্থ রসঃ-স্বরূপের বিকাশ । শ্রীকৃষ্ণ রসরূপে পরম-মধুর, আত্মবিস্মাপনরূপ (শ্রীভা, ৩২।১২), সাক্ষাৎসম্মতমুখ (শ্রীভা, ১০।৩২।২) । শ্রীকৃষ্ণ রস-আস্বাদকরূপে স্বীয়পরিকরবর্গের সঙ্গে দাস্ত-সখ্য-বাৎসল্য-মধুরাদি নানারসোদগারিণী লীলায় বিলাসবান্—লীলারসের এবং ভক্তের প্রেমরসনির্যাসের আস্বাদনার্থ (শ্রীভা, দশম স্কন্ধ) । ঐশ্বর্য্যাগ্নিকা ও মাধুর্য্যাগ্নিকা উভয় প্রকার লীলায় বিলাসবান্—বৈকুণ্ঠে ঐশ্বর্য্যাগ্নিকা, দ্বারকা-মথুরায় ঐশ্বর্য্যমিশ্রিত-মাধুর্য্যাগ্নিকা এবং ব্রজে শুদ্ধমাধুর্য্যাগ্নিকা লীলা । প্রেমবশ্ততার পরাকাষ্ঠা—বাৎসল্যপ্রেমের বশে যশোদামাতার হাতে বন্ধনপর্য্যন্ত স্বীকার, কান্তাপ্রেমের বশে গোপসুন্দরীদিগের নিকটে অপরিশোধ্যভাবে ঋণিত্ব স্বীকার (শ্রীভা, ১০।৩২।২২) ।

পরব্রহ্মের শক্তির পরিচয় :—প্রণবে প্রচ্ছন্ন, জগৎ-কর্তৃত্বে এবং সর্বজ্ঞত্বাদিতে শক্তির অস্তিত্বের ইঙ্গিত । গায়ত্রীতে ভর্গ-শব্দে শক্তির উল্লেখ । গীতায় জীবশক্তির ও মায়াশক্তির স্পষ্ট উল্লেখ ; তাৎপর্য্যে স্বরূপশক্তির উল্লেখ । মায়াশক্তি স্বরূপ, বজ্রঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণ্যাগ্নিকা । চতুঃশ্লোকীতে মায়াশক্তির স্পষ্ট উল্লেখ । শ্রীমদ্ভাগবতে ত্রিগুণ্যাগ্নিকা মায়াশক্তির উল্লেখ ; তাহার জীবমোহিনী শক্তি, ভগবানের বহির্ভাগে অবস্থিতি । স্বরূপশক্তি ও লীলা-শক্তির (যোগমায়া) এবং জীবশক্তির উল্লেখ ।

পরব্রহ্মের ধামাদিরূপে বিকাশ । প্রণবে ব্রহ্মলোক । গায়ত্রীর শিরোভাগে ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বঃ-শব্দাদিতে ধামের-নিত্যত্ব, সর্বসুখময়ত্ব, চিদ্রায়ত্ব, সর্বব্যাপকত্ব ও স্বপ্রকাশত্বের উল্লেখ । গীতায় পরম-ধামের উল্লেখ । চতুঃশ্লোকীতে বৈকুণ্ঠাদির তাৎপর্য্যে উল্লেখ । শ্রীমদ্ভাগবতে বৈকুণ্ঠ, দ্বারকা, মথুরা, ব্রজ, বৃন্দাবনাদির উল্লেখ ।

পরিকরাদিরূপে পরব্রহ্মের বিকাশ । প্রণবে সম্পূর্ণরূপে প্রচ্ছন্ন । গায়ত্রীতে “দেবস্ত”-শব্দে ইঙ্গিত । গীতায় “দিব্যং কৰ্ম্ম”-(৪।৩)-শব্দে ইঙ্গিত । চতুঃশ্লোকীতে “অহমেবাসমেবাগ্রে”-ইত্যাদি শ্লোকে ইঙ্গিত । শ্রীমদ্ভাগবতে নন্দ, যশোদা, গোপী, উদ্ধবাদিতে স্পষ্ট উল্লেখ ।

শক্তি, ধাম, পরিকরাদি পরব্রহ্মেরই স্বরূপের অন্তর্ভুক্ত ।

অভিধেয় তত্ত্ব :—প্রণবে ধ্যান । গায়ত্রীতে ধ্যান । গীতায় কৰ্ম্ম, যোগ, জ্ঞান, ভক্তি—ভক্তির সর্বগুহ্যতমত্ব, স্মৃতির সর্বশ্রেষ্ঠত্ব । চতুঃশ্লোকীতে সাধনভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব । শ্রীমদ্ভাগবতে কৰ্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি হইতেও ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব । অবগ-কীর্তনাদি নববিধা সাধন-ভক্তির স্পষ্ট উল্লেখ ।

প্রয়োজনতত্ত্ব :—প্রণবে ব্রহ্মকে জানা ; যাহা ইচ্ছা, তাহার প্রাপ্তি, ব্রহ্মলোকে মহীয়ান্ হওয়া । গায়ত্রীতে মায়ানিবৃত্তির ইঙ্গিত ; গায়ত্রী-শিরোভাগে ভূভুবঃস্বঃ এর উল্লেখ চিদ্রূপ নিত্যসর্বসুখময় ধাম প্রাপ্তির ইঙ্গিত । গীতায় ব্রহ্মসামুদ্র্য, পরমাত্মার সহিত যোগ এবং সেবারূপে ভগবৎ-প্রাপ্তির উল্লেখ, ভগবৎ-প্রাপ্তির পরমগুহ্যতমত্বের—স্মৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ-কাম্যত্বের উল্লেখ । চতুঃশ্লোকীতে ভগবানের ষথার্থ অন্তর্ভবলাভ এবং তাহার উপায়রূপে প্রেমের উল্লেখ । শ্রীমদ্ভাগবতে যোগ-জ্ঞানাদির লভ্য অপেক্ষা কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী শ্রীকৃষ্ণসেবা এবং তাহার উপায়ভূত প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব । প্রেমের অসাধারণ-ভগবদ্বশীকরণী-শক্তির কথা শ্রীমদ্ভাগবতেই সর্বপ্রথম দৃষ্ট হয় ।

গ্রন্থের কলেবর-বৃদ্ধির আশঙ্কায় শ্রীমদ্ভাগবতে প্রণবের অর্থবিকাশের বিস্তৃত আলোচনা করা হইল না, কেবল সূত্রাকারে উল্লেখ করা হইল ।

প্রণবরূপ বীজ শ্রীমদ্ভাগবতে শাখাপত্রপুষ্পশোভিত বিরাট ফলবান্ বৃক্ষরূপে পরিণতি লাভ করিয়াছে । গায়ত্রীর শিরোভাগে রস-শব্দে (শ্রুতিপ্রোক্ত রসো বৈ সঃ) পরব্রহ্মের পরম আস্বাদত্বের এবং পরম-আস্বাদকত্বের

যে ইঙ্গিত করা হইয়াছে, কেবলমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতেই তাহার বিশেষ বিবৃতি দৃষ্ট হয়। ক্রতি যে ব্রহ্মকে আনন্দ-স্বরূপ এবং রস-স্বরূপ বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য শ্রীমদ্ভাগবতেই পরিষ্কৃত হইয়াছে। উপনিষদাদি সমগ্র শাস্ত্রের একমাত্র অনুসন্ধেয় রসস্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অগমোক্তমাধুর্য্য-নিঃশ্রম্বিনী লীলাতরঙ্গিনীর রসধারায় পরিনিষিক্ত শ্রীমদ্ভাগবতও এক অপূর্ব্ব অনির্লচনীয়া পরমাস্বাদ্য রসভাণ্ডাররূপে জগতে প্রকটিত হইয়াছেন। তাই বলা হইয়াছে—“নিগমকল্পতরোগলিতং কলং শুকমুখাদমৃতরসসংযুতম্ পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মূহুরহো রসিকা ভবি ভাবুকাঃ ॥ শ্রীভা, ১।১।৩ ॥

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে প্রণবের অর্থবিকাশ। প্রণবের এবং গায়ত্রীর যে অর্থ শ্রীমদ্ভাগবতে বিকশিত হইয়াছে, তাহার কোনও কোনও অংশ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উজ্জ্বলতর ভাবে পরিষ্কৃত হইয়াছে। এখানে অতি সংক্ষেপে দিগ্‌দর্শন দেওয়া হইতেছে। মাত্র শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত বিশেষত্বগুলিই উল্লিখিত হইবে।

অভিধেয়-তত্ত্ব। সাধন-ভক্তিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—বৈদী ভক্তি ও রাগানুগা ভক্তি। উভয় প্রকারেই অমুষ্ঠানের অঙ্গগুলি প্রায় একই—শ্রবণ-কীৰ্ত্তনাদি। পার্থক্য কেবল সাধন-প্রবর্তক মনোভাবে। যাহারা শাস্ত্রের আদেশেই কেবল কর্তব্য-বুদ্ধিতে ভজনে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের ভজনকে বলে বৈদীভক্তি (শাস্ত্রবিধি-দ্বারা প্রণোদিত সাধনভক্তি)। আর যাহারা শাস্ত্রবিধির অপেক্ষা না রাখিয়া কেবল প্রাণের টানে ভজনে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের ভজনকে বলে রাগানুগাভক্তি। বৈদীভক্তি হইল ভজনের-নিমিত্ত-শাস্ত্রবিধির অনুগত—শাস্ত্রে ভজনের আদেশ আছে বলিয়াই ভজনে প্রবৃত্তি। ভজন না করিলে পরকালে দুঃখভোগ হইতে পারে—এই ভয়ে ভজনে প্রবৃত্তি। আর রাগানুগা হইল রাগ বা আসক্তি বা লোভের অনুগত; এখানে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের জন্ত লোভবশতঃই ভজনে প্রবৃত্তি; ইহা স্বতঃস্ফূর্ত। বৈদীর ভজন বিধি-স্ফূর্ত।

বৈদীভজনে সাধারণতঃ ভগবানের ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান, তাঁহার মাহাত্ম্যের জ্ঞান প্রাদাণ্য লাভ করে। সিদ্ধি-কাল পর্য্যন্তও যদি এইরূপ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের প্রাদাণ্যই থাকিয়া যায়, তাহা হইলে ঐশ্বর্য্য-প্রধান পরব্রাহ্মেই মাকপ্যাদি চতুর্বিধা মুক্তির কোনও এক মুক্তি লাভ করিয়া সাধক বৈকুণ্ঠেশ্বরের সেবা পাইয়া থাকেন। ইহাতে ভগবানের যথার্থ অনুভব লাভ হয়না। কারণ, বৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণে ঐশ্বর্য্যের বিকাশই সর্বাতিশায়ী; তাই ভক্তের পক্ষে মন-প্রাণ-ঢালা সেবার অবকাশ নাই। মনপ্রাণঢালা সেবা ব্যতীত ভগবানের মাধুর্য্য আনন্দের সম্ভাবনা নাই; শুদ্ধমাধুর্য্যের আনন্দনেই যথার্থ অনুভব।

রাগানুগাতে মাধুর্য্যের জ্ঞানই প্রধান। কারণ, মাধুর্য্যের আকর্ষণেই লোভ জন্মায়, এই লোভই ভজনের প্রবর্তক। তাই রাগানুগার ভজনে সাধক শুদ্ধমাধুর্য্যময় ব্রজধামে মাধুর্য্যঘন-বিগ্রহ রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাইয়া তাঁহার যথার্থ অনুভব লাভ করিতে পারে। ইহাই পরম পুরুষার্থ।

বৈদীভক্তির অমুষ্ঠানে প্রবৃত্ত সাধকেরও ভাগ্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য আনন্দের লোভ জন্মিতে পারে। এই লোভ জন্মিলে তখন হইতে তাঁহার ভজনও রাগানুগার ভজনই হইবে।

সম্বন্ধ-তত্ত্ব। শক্তি। স্বরূপ-শক্তি তিনরূপে প্রকাশ পায়—হ্লাদিনী, সঙ্কিনী এবং সখিঃ (বিষ্ণুপুরাণ ১।১২।৬২)। সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণের সং-অংশের শক্তির নাম সঙ্কিনী (সৎসম্বন্ধিনী শক্তি, আদার-শক্তি), চিৎ-অংশের শক্তির নাম সখিঃ (জ্ঞানসম্বন্ধিনী শক্তি) এবং আনন্দাংশের শক্তির নাম হ্লাদিনী (আনন্দদায়িকা শক্তি)। সঙ্কিনী অপেক্ষা সখিতের, সখিঃ অপেক্ষা হ্লাদিনীর উৎকর্ষ। শক্তির অভিব্যক্তি দুইরূপে—অমূর্ত্ত এবং মূর্ত্ত। অমূর্ত্তরূপে শক্তি থাকে শক্তিমানের মধ্যে। মূর্ত্তরূপে হয় শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। (কোনোপনিষদে মায়ার মূর্ত্ত-বিগ্রহের কথা শুনা যায়)।

ভগবানের ধাম, লীলাপরিধার এবং লীলার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি—সমস্তই তাঁহার স্বরূপশক্তির বিলাস-বিশেষ।

ঋকু-পরিশিষ্ট-প্রোক্ত-শ্রীরাধিকা। হ্লাদিনীর মূর্ত্ত বিগ্রহ এবং সর্কশক্তির অধিষ্ঠাত্রী (রাধাতত্ত্ব প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। ভক্তি এবং প্রেমও হ্লাদিনীরই বৃত্তিবিষেষ। তাই পরম আশ্বাচ্ছ। প্রেমের চরমতম বিকাশ যে স্তরে, তাহার নাম মাদনাথ্য-মহাভাব। শ্রীরাধাতেই এই মাদন বিদ্যমান। তিনি মহাভাবেরই মূর্ত্তরূপ—মহাভাব-স্বরূপা। তিনি সমস্ত ভগবৎ-কাস্তাগণের অংশিনী।

স্বরূপ। শ্রীমদ্ভাগবতের আত্মপর্যন্তবিস্মাপন-রূপধর সাক্ষাৎসম্মত শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে “ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্। সর্ক-অবতারী সর্ক-কারণ প্রধান॥ অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহা সভার আধার॥ সচ্চিদানন্দ-তমু ব্রজেন্দ্র-নন্দন। সর্কৈশ্বর্য্য সর্কশক্তি সর্করসপূর্ণ॥ বৃন্দাবনে অপ্ৰাকৃত নবীন মদন। কামগায়ত্রী কামবীজে ঋর উপাগন॥ পুরুষ যোষিং কিস্বা স্থাবর জঙ্গম। সর্কচিন্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্থ-মদন॥ নানা ভক্তের রসামৃত নানাবিধ হয়। সেই সব রসামৃতের বিষয় আশ্রয়॥ শৃঙ্গার-রসরাজময় মূর্ত্তিধর। অতএব আত্মপর্যন্ত সর্কচিন্ত হর॥ লক্ষ্মীকান্ত-আদি অবতারের হরে মন। লক্ষ্মী-আদি নারীগণের করে আকর্ষণ॥ আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন। আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন॥ ২।৮।১০৬-১৪॥”

উদ্ধৃত পয়ারসমূহে শ্রীকৃষ্ণকে “মন্থ-মদন” এবং “অপ্ৰাকৃত নবীন মদন” বলা হইয়াছে। এই দুইটা নামের একটু তাৎপর্য্য ব্যক্ত করা আবশ্যক।

মন্থ-মদন-শব্দে মদনমোহন বুঝায়; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যের এমন এক সর্কতিশায়ী বিকাশকে বুঝায়, যাহাতে অপ্ৰাকৃত মদনপর্যন্ত মুগ্ধ হইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশ রূপের বিকাশ হয় একমাত্র তখন, যখন তিনি ‘শ্রীরাধার সান্নিধ্যে থাকেন। “রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ। অচ্ছথা বিশ্বমোহোহপি স্বয়ং মদনমোহিতঃ॥” শ্রীরাধার সান্নিধ্যে যখন তিনি থাকেন, তখন তাঁহার অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার স্বমুখের উক্তি এই—“মন্থাধুর্য্য রাধাপ্রেম দৌহে হোড় করি। ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দৌহে কেহো নাহি হারি॥” পরিকর-ভক্তের প্রেমই শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিক মাধুর্য্যকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিতে পারে। এইরূপই “মন্থ-মদন”-শব্দের তাৎপর্য্য।

শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎসম্মত-মন্থও বলা হইয়াছে। যাহার মোহিনীশক্তির এক কণিকার আভাস লাভ করিয়া প্রাকৃত মদন সমস্ত জগৎকে মুগ্ধ করেন, তিনি হইলেন অপ্ৰাকৃত মন্থ। চক্ষুর চক্ষুর ছায়, যিনি মন্থেরও মন্থ—যিনি অপ্ৰাকৃত মন্থেরও মূল, তিনি মন্থ-মন্থ। সাক্ষাৎ মন্থ-মন্থ—স্বয়ং মন্থ-মন্থ; যাহার মোহিনী-শক্তির এক অংশ মাত্র অপ্ৰাকৃত মন্থের মোহিনী শক্তি, তিনিই স্বয়ং মন্থ-মন্থ। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের চিত্তাকর্ষণী শক্তির সর্কতিশায়িতা প্রকাশ পাইতেছে।

আর “অপ্ৰাকৃত নবীন মদন”-বাক্যের তাৎপর্য্য এইরূপ। স্বীয় অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্যে সকলের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া, সকলের চিত্তে সেই মাধুর্য্য-আস্বাদন-বাসনার উদ্ভাসিতা জন্মাইয়া, সকলকে উন্মত্ত করিয়া তোলেন বলিয়া তিনি “মদন”। তাঁহার যে মাধুর্য্য এই উন্মত্ততার হেতু, তাহা প্রতিফলনে নব-নবায়মান বলিয়া তিনি “নবীন-মদন”। তিনি এবং তাঁহার মাধুর্য্য অপ্ৰাকৃত চিদ্বস্ত বলিয়া তিনি “অপ্ৰাকৃত নবীন মদন”।

বাসনার (বা কামনার) উদ্ভাসিতা জন্মাইয়া যিনি মত্ততা জন্মাইতে পারেন, তাঁহাকে কামদেবও (কামের—কামনার—বাসনার দেবতা বা নিয়ন্তা) বলা যায়। এইভাবে পরব্রহ্ম-শ্রীকৃষ্ণকে “অপ্ৰাকৃত নবীন কামদেবও” বলা যাইতে পারে। তিনি প্রাকৃত কামদেব নহেন; যেহেতু, প্রাকৃত কামদেবের ছায় তিনি প্রাকৃত ভোগ্যবস্তুর জন্ত বাসনা জন্মান না; তাঁহার মাধুর্য্য-আস্বাদনের বাসনা জাগাইয়া বরং প্রাকৃত-ভোগ্যবাসনা তিনি দূরীভূত করেন।

সকল দেবতারই বীজ এবং গায়ত্রী থাকে; বীজ এবং গায়ত্রী দেবতার নামেই অভিহিত হয় এবং তাহাতে দেবতার স্বরূপই প্রকাশিত হয়। এই অপ্ৰাকৃত কামদেবেরও তাঁহার স্বরূপব্যঞ্জক বীজ এবং গায়ত্রী আছে—কামবীজ ও কামগায়ত্রী। তাই বলা হইয়াছে—“বৃন্দাবনে অপ্ৰাকৃত নবীন মদন। কামগায়ত্রী কামবীজে তাঁর

উপাসন ॥” প্রাকৃত কামদেবকে “কুল-শর” বলে, “পঞ্চশর”-ও বলে। তাঁর যেন পাঁচটি ফুলের শর (বাণ) আছে, তদ্বারা তিনি তাঁহার শিকারকে বিদ্ধ করেন অর্থাৎ প্রাকৃত ভোগ-বাসনায় বিচলিত করেন। “পঞ্চশর” বলার সার্থকতা এই যে, প্রাকৃত রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ—এই পাঁচটি বস্তুর ভোগের জন্ত বাসনা জাগাইয়া ভীষকে তিনি জর্জরিত করেন; এক একটা বস্তুর জন্ত বাসনাই তাঁহার এক একটা শর। তাঁহার বাণ ফুলের আকারে—লোভনীয় বস্তুর আকারে—আসে; ভীতি উৎপাদন করে না। “অপ্রাকৃত নবীন মদন”—শ্রীকৃষ্ণেরও পাঁচটি শর আছে—স্বীয় অপ্রাকৃত রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ আশ্বাদনের বলবতী বাসনারূপ শর। এই বাসনাও পরম-লোভনীয় বস্তুর জন্ত লোভনীয় বাসনারূপেই আসে। তাই এই পাঁচটি বাসনাকেও “অপ্রাকৃত নবীন মদনের” পাঁচটি পুষ্পবাণ বলা যায় এবং তাঁহার এইরূপ পুষ্পবাণ আছে বলিয়া তাঁহাকেও “পুষ্পবাণ” বলা যায়।

শ্রীকৃষ্ণরূপাদির পরম-লোভনীয়তার এবং মহা-আকর্ষণী শক্তির পরিচয় দেওয়ার ভাষা নাই। রাধাভাবাবিষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথায় সামান্য একটু দিগদর্শন অন্তরে দেওয়া হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের রূপাদি পাঁচটি বস্তুর আকর্ষণে তাঁহার পাঁচটি ইন্দ্রিয় প্রবলবেগে আকৃষ্ট হওয়াতে তাঁহার একটা মনের কি অবস্থা হইয়াছিল, নিম্নোক্ত বাক্যসমূহে তাহাই তিনি বর্ণন করিয়াছেন।

“কৃষ্ণ-রূপ-শব্দ-স্পর্শ, সৌরভ অধর-রস, যার মাধুর্য্য কহন না যায়। দেখি লোভী পঞ্চজন, এক অশ্ব মোর মন, চড়ি পঞ্চ পাঁচ দিগে ধায় ॥ সখি হে শুন মোর দুঃখের কারণ। মোর পঞ্চেন্দ্রিয়গণ, মহালক্ষ্যে দক্ষাগণ, সন্তে করে হরে পরধন ॥ এক অশ্ব এক ক্ষণে, পাঁচ পাঁচ দিকে টানে, এক মন কোন দিকে যায়। এক কালে সন্তে টানে, গেল ঘোড়ার পরাণে, এই দুঃখ সহনে না যায় ॥ ইন্দ্রিয়ে না করি রোয়, ইহা সভার কাঁই দোষ, কৃষ্ণরূপাদি মহা আকর্ষণ ॥ রূপাদি পাঁচ পাঁচ টানে, গেল ঘোড়ার পরাণে, মোর দেহে না রহে জীবন ॥ কৃষ্ণরূপামৃতসিক্ত, তাঁহার তরঙ্গবিন্দু, এক বিন্দু জগত ডুবায় ॥...কৃষ্ণের বচনমাধুরী, নানারস নরুধারী, তার অচ্যায় কহন না যায় ॥...কৃষ্ণ-অঙ্গ সুশীতল, কি কহিব তার বল, ছটায় জিনে কোটীন্দু চন্দন ॥...কৃষ্ণাঙ্গ-সৌরভাভর, যুগমদ-মদহর, নীলোৎপলের হরে গরুধন ॥...কৃষ্ণের অধরামৃত, তাতে কর্পূর মন্দস্বিত, স্বমাধুর্য্যে হরে নারীমন। ছাড়ায় অগ্রজ লোভ, না পাইলে মনে ক্ষোভ, ব্রজনারীগণের মূলধন ॥ এত কহি গৌরহরি, দু’জনের কর্ণধরি, কহে শুন স্বরূপ-রামরায়। কাঁই করোঁ কাঁই যাও, কাঁই গেলে কৃষ্ণ পাও, দোহে মোরে কহ সে উপায় ॥ ৩১৫।১৩-২২ ॥”

এক্ষণে কামবীজ ও কামগায়ত্রীর উল্লেখ করা হইতেছে। “তৎসবিতুর্বরেন্যমিত্যাদি”—পূর্বোক্তগিহিত গায়ত্রী যেমন প্রণবসহ জপ করিতে হয়, কামগায়ত্রীও তদ্রূপ কামবীজসহ জপের বিধি।

কামবীজ—ক্লীম্। শ্রুতি বলেন, কামবীজ ও প্রণব একই বস্তু। “ক্লীমোঙ্কারৈক্যস্য পঠ্যতে ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥ গো, তা, উ, তা, ৫৯ ॥” কামবীজ এবং প্রণব এক হইলেও কামগায়ত্রীর সঙ্গে প্রণবের যোগ না করিয়া কামবীজ যোগ করার হেতু বোধ হয় এই যে, কামবীজে এক অপূর্ব অনির্কচনীয় মাধুর্য্যের ব্যঞ্জনা আছে। “সাক্ষাৎ-মন্থ-মন্থ অপ্রাকৃত নবীন মদনের” উপাসনায়—তাই প্রণব অপেক্ষা কামবীজই প্রশস্ততর। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।২৯।৩-শ্লোকের অন্তর্গত “জগৌ-কলং বামদৃশং মনোহরম্ ॥”—বাক্যাংশের অর্থে শ্রীপাদ সনাতনগোষামী লিখিয়াছেন—“অত্র শ্লেষণ কামবীজং জগাবিতি রহস্যম্। যতো বামদৃকসম্বন্ধি যন্তৎসহিতং কলমিতি প্রথমাক্ষরত্রয়ং ব্যঞ্জিতম্। কীদৃশং মনোহরং মনঃশব্দেন তদধিষ্ঠাতা চন্দ্র উচ্যতে। স চ তদাকারত্বেন লবকঃ তৎ হরতীতি আকর্ষতীতি তৎ সম্বলিতমিত্যর্থঃ।” চক্রবর্তিপাদ লিখিয়াছেন—“শ্লেষণ কলং ককার-লকারম্। বামদৃশামিতি লুপ্তবিভক্তিকং পদং বামদৃক চতুর্থঃ স্বরঃ। তয়া সহ পঞ্চদশস্বরং কামবীজং জগাবিতি রহস্যং মনোহরং মনসঃ আকর্ষকত্বাৎ স্ব-স্বরূপভূত-মহামন্থ-মন্থমিত্যর্থঃ।” উক্ত শ্লোকাংশের যথাক্রম অর্থ এই—রাসারম্ভে গোপীমণ্ডলীকে আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় বেণুসহযোগে “বামনয়নাদিগের মনোহর কল-গান করিয়াছিলেন।” টীকাকারগণ বলিতেছেন—ইহা যথাক্রম অর্থ হইলেও শ্লেষণে উক্তবাক্যে একটা রহস্য নিহিত আছে। সেই রহস্যটি হইতেছে এই যে, শ্রীকৃষ্ণ

স্বীয় বেণুযোগে স্বীয়-স্বরূপভূত-মহা-ময়ধ্ব-সূচক কামবীজই গান করিয়াছিলেন। উদ্ধৃত বাক্যাংশে কিরূপে কামবীজ বুঝাইতে পারে, তাহাও তাঁহারা বলিয়াছেন। কামবীজে (ক্লীম্ বা ক্লী-এ) এ-কয়টি অক্ষর আছে—ক, ল, ঙ্গ (স্বরবর্ণের চতুর্থ অক্ষর) এবং ৬ (স্বরবর্ণের পঞ্চদশ অক্ষর)। শ্লোকস্থ “কলং”-শব্দে ক এবং ল-এই দুইটি অক্ষর আছে। বামদৃক-শব্দে চতুর্থ স্বরবর্ণ (ঙ) বুঝায়। মনোহরং-শব্দের অন্তর্গত মনঃ-শব্দে মনের অধিষ্ঠাতা চন্দ্রকে বুঝায়। দ্বিতীয়া কি তৃতীয়ার চন্দ্রের সঙ্গে পঞ্চদশ স্বরবর্ণ চন্দ্রবিন্দুর আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে বলিয়া মনঃ-শব্দে চন্দ্রবিন্দুকে বুঝায়। তাহাকে (চন্দ্রবিন্দুকে) হরণ বা আকর্ষণ করিয়া নিজের সুঙ্গে সংযুক্ত করে যে “কলং”, সেই “মনোহরং কলম্”। এইরূপে ক, ল, ঙ্গ এবং ৬—এই কয়টি অক্ষরের যোগে কামবীজ হইল। গোপীদিগের আকর্ষণের জন্য শ্রীকৃষ্ণ এই কামবীজ গান করিয়াছিলেন এবং তাহা শুনিয়াই গোপীগণ—যিনি যেই অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থাতেই, বেদধর্ম-কুলধর্ম-লোকধর্ম-স্বজন-আর্য্যপথ সমস্ত ত্যাগ করিয়া—উন্মত্তের ছায়া ধাবিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সমীপে উপনীত হইয়াছিলেন। ইহা হইতেই কামবীজের সর্বাাকর্ষকত্ব—সর্বাচিহ্ন-মোহনত্ব সূচিত হইতেছে। ইহাই প্রণব অপেক্ষা কামবীজের বৈশিষ্ট্য। প্রণবের মধ্যে যাহা অত্যন্ত গূঢ়ভাবে আছে, কামবীজে তাহা অনাবৃত—প্রকাশ—ভাবে আছে।

কামগায়ত্রী এই—“কামদেবায় বিষ্ণুহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোহনসঃ প্রচোদয়াৎ ॥”

এই গায়ত্রীতে—প্রথমতঃ, যিনি স্বীয় সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি দ্বারা সকলের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া, সেই সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদির আশ্বাদন-বাসনা জাগাইয়া, সেই বাসনাকে উদ্দাম করিয়া মত্ততা জন্মাইয়া থাকেন, সেই অপ্রাকৃত কামদেব রস-স্বরূপ পরব্রহ্মকে জানার কথা (প্রণবোক্ত-“ব্রহ্মকে জানার” কথা), দ্বিতীয়তঃ, যিনি তাঁহার রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ—এই পাঁচটি পরম-লোভনীয় এবং মহা আকর্ষণী শক্তিসম্পন্ন বস্তুর আশ্বাদন-বাসনাজনিত পরম-উৎকর্ষার তীব্র যন্ত্রণায়—চিত্তকে জর্জরিত করিতে সমর্থ, সেই অপ্রাকৃত-কন্দর্প রসস্বরূপ-পরব্রহ্মের ধ্যানের কথা এবং তৃতীয়তঃ, তাদৃশ পরম-রমণীয়, পরম-চিত্তাকর্ষক রসস্বরূপ-পরব্রহ্মকর্তৃক মনের বা বুদ্ধির প্রেরণের কথা দৃষ্ট হয়। প্রণবের সহিত অল্প কামবীজের সহিত সংযুক্ত থাকাতেই কামগায়ত্রীর অন্তর্ভুক্ত “কামদেব”, “পুষ্পবাণ” এবং “অনসঃ”-শব্দত্রয়ে প্রণবোক্ত পরব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে।

প্রণবে, গায়ত্রীতে, গীতায়, চতুষ্টোত্রীতে এবং শ্রীমদ্ভাগবতেও ব্রহ্মের দুইটি রূপের কথা জানা যায়—অপর এবং পর। পর-রূপের এক রকম বিকাশই অপর-রূপ। প্রণবের অর্থালোচনায় এবং আরও পরিষ্কাররূপে চতুষ্টোত্রীতে আমরা দেখিয়াছি, অপর-রূপ পররূপের একরকম অতিব্যক্তি হইলেও অপর-রূপের সঙ্গে পর-রূপের স্পর্শ নাই। জীবের সহিত পর-রূপেরই নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ—অপর-রূপের নহে। প্রণব এবং শ্রুতি যে ব্রহ্মকে জানার কথা বলিয়াছেন, সেই ব্রহ্মও পরব্রহ্মই—অপর-ব্রহ্ম নহেন; কারণ, অপর-ব্রহ্ম কালান্বিত এবং পর-ব্রহ্ম কালাতীত। জীবের সহিত নিত্যসম্বন্ধযুক্ত এই কালাতীত পরব্রহ্মের ইঙ্গিত গায়ত্রীর শিরোভাগে “আপো-জ্যোতিরিত্যাদি”-বাক্যে পাওয়া যায়, আর পাওয়া যায় শ্রুতিতে—“আনন্দং ব্রহ্ম”, “রসো বৈ সঃ”—ইত্যাদি বাক্যে। শ্রীমদ্ভাগবতেই সর্বপ্রথমে এই “রস-স্বরূপের” বিশেষ বিবরণ পাওয়া গিয়াছে।

গায়ত্রীতে পর-ব্রহ্মের রস-স্বরূপত্বের ইঙ্গিতমাত্র আছে শিরোভাগে। কিন্তু শিরোভাগ জপ্য-গায়ত্রীর অঙ্গীভূত নহে। মহাব্যাহতিসহ সপ্রণব গায়ত্রীরই জপের ব্যবস্থা।

জপ্য-গায়ত্রীতে যে ধ্যানের ব্যবস্থা আছে, তাহার উদ্দেশ্য যে মায়ানিবৃত্তি, মায়নাচার্য্যকৃত “ভর্গ”-শব্দের অর্থ হইতেই তাহা জানা যায়। গায়ত্রীস্থ “সবিতু”-শব্দও সাধকের চিত্তকে ব্রহ্মের অপর-রূপের দিকেই যেন একটু টানিয়া নিতে চায়; তাহাতে বুঝা যায়, এই “সবিতু”-শব্দটিও মায়ানিবৃত্তির ইঙ্গিতই বহন করিতেছে। অবশ্য “দেবশ্চ”-শব্দের একটা গূঢ় ব্যঞ্জনা আছে; কিন্তু তাহা এত গূঢ় যে, সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে না। শ্রীপাদ মায়নও এই ব্যঞ্জনাকে রহস্যময়ই রাখিয়া গিয়াছেন। রহস্য উদ্ঘাটিত না হইলে গায়ত্রী হইতে

মায়া-নিবৃত্তির বেশী কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু জীবের মায়ানিবৃত্তি পরব্রহ্মকে জানার পথে একটি ব্যাপারমাত্র হইলেও, তাহাই পরব্রহ্মকে জানা নয়। পরব্রহ্মকে জানার উপদেশ প্রণবে ইঙ্গিতে এবং শ্রুতিতে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইলেও গায়ত্রীতে বেশ একটু প্রচ্ছন্ন। প্রচ্ছন্ন বলিয়া, গায়ত্রী যে কেবল পরব্রহ্ম-বিষয়ক, তাহাও সকলের চক্ষুতে ধরা পড়ে না; সায়নাচার্য্য গায়ত্রীর সূর্য্যবিষয়ক এবং কর্ম-বিষয়ক অর্থ করিয়া তাহাও দেখাইয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্মকে জানাই যখন শ্রুতির আদেশ, তখন এই সূর্য্যাদিবিষয়ক অর্থ যে নিতান্ত বাহিরের কথা, তাহা সহজেই বুঝা যায়। আর কেবল মায়ানিবৃত্তিকেও একরকমের বাহিরের কথা বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না; কারণ, ব্রহ্মকে জানার তাৎপর্য্য যদি পরব্রহ্মের যথার্থ-অমুভূতিই হয়, তাহা হইলে মায়ানিবৃত্তিমাত্রে ব্রহ্মের যথার্থ-অমুভূতি জন্মে না।

ব্রহ্মকে জানার চেষ্টা দুই ভাবে হইতে পারে—কর্তব্য-বুদ্ধিবশতঃ এবং লোভবশতঃ। কর্তব্য-বুদ্ধি-প্রবর্তিত প্রয়াস অপেক্ষা লোভ-প্রবর্তিত প্রয়াসের মূল্য অনেক বেশী এবং লোভ-প্রবর্তিত প্রয়াসই পরব্রহ্মের যথার্থ-অমুভূতির অমুকুল। কিন্তু পর-ব্রহ্মের লোভনীয় রূপটি যদি সাধকের মনচ্ছকুর সাক্ষাতে ধরা যায়, তাহা হইলেই তাহাতে লোভ জন্মিবার সম্ভাবনা। “আনন্দং ব্রহ্ম”, “রসো বৈ সঃ”—ইত্যাদি বাক্যে সেই লোভনীয় রূপটির কথা শ্রুতিতে থাকিলেও তাহার প্রতি প্রত্যহ লোকের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। যদি তাহা নিত্য-জপ্য গায়ত্রীতে স্পষ্টভাবে থাকিত, তাহা হইলে অন্ততঃ গায়ত্রী-জপের সময়েও সেই দিকে মনোযোগ আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা থাকিত। কিন্তু গায়ত্রীতে তাহা নাই। গায়ত্রীর শিরোভাগে গূঢ়ভাবে তাহা থাকিলেও শিরোভাগ জপ্য-গায়ত্রীর বহির্ভূত। সুতরাং জপ্য-গায়ত্রী রস-স্বরূপ পরব্রহ্মের প্রতি লোভ জন্মাইবার পক্ষে ততটা অমুকুল নয়; এবং গায়ত্রীর সূর্য্যাদি-পর-অর্থে বরং তাহা প্রতিকূলই।

কামগায়ত্রীতে কিন্তু রস-স্বরূপ ব্রহ্মের লোভনীয় রূপটি সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। কামগায়ত্রীতে এই রূপটি অনাবৃত, স্পষ্ট। অতি অল্প কথায় এবং অল্পরূপ অর্থ করার সম্ভাবনারহিত ভাবে কামগায়ত্রী সেই পরম-লোভনীয় রূপটির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাকেই জানিবার কথা বলিয়াছেন, জানিবার জন্ত তাহারই ধ্যানের কথা বলিয়াছেন এবং তাহার এই সর্ব্বচিত্তাকর্ষক রূপের প্রতি তিনি যেন আমাদের মনকে—বুদ্ধিকে—প্রেরণ করেন, আকর্ষণ করেন, এইরূপ প্রার্থনার ইঙ্গিতও দিয়াছেন।

কামবীজ যেমন প্রণবেরই রসাত্মকরূপ, কামগায়ত্রীও তদ্রূপ, “ভূভুবঃ স্বঃ”—ইত্যাদি পূর্ব্বোল্লিখিত গায়ত্রীর রসাত্মক রূপ। কামগায়ত্রীতে যেমন সাড়ে চব্বিশটি অক্ষর, কামগায়ত্রীর অক্ষর-গণনা-প্রণালী অমুসারে পূর্ব্বোল্লিখিত গায়ত্রীতেও সাড়ে চব্বিশটি অক্ষর (গায়ত্রীর অক্ষর-গণনায় “বরেণ্যং”—শব্দকে “বরেণীয়ং” ধরা হয়)। গায়ত্রী যেমন প্রণব-সংযোগে জপ করিতে হয়, কামগায়ত্রীও তদ্রূপ প্রণবের সহিত অভিন্ন কামবীজ-সংযোগে জপ করিতে হয়। রূপ এবং পরিমাণ উভয়েরই এক; পার্থক্য কেবল এই যে, গায়ত্রীতে রস-স্বরূপটি প্রচ্ছন্ন—অবৃত, আর কামগায়ত্রীতে তাহা অনাবৃত।

রাধাভাবাবিষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রলাপ-বাক্যে কামগায়ত্রীতে অভিব্যক্ত রস-স্বরূপ পরব্রহ্মের রূপটি জাম্জল্যমান ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রলাপ-বাক্যগুলি এই। “কামগায়ত্রী মন্ত্ররূপ, হয় কৃষ্ণস্বরূপ, সার্কি চব্বিশ অক্ষর যার হয়। সে অক্ষর চন্দ্র হয়, কৃষ্ণে করি উদয়, ত্রিজগৎ কৈল কামময় ॥ সখি হে কৃষ্ণমুখ দ্বিজরাজ-রাজ। কৃষ্ণবপু সিংহাসনে, বসি রাজ্যশাসনে, করি সঙ্গে চন্দ্রের সমাজ ॥ দুই গও সূচিকণ, জিনি মণি দর্পণ, সেই দুই পূর্ণ চন্দ্র জানি। ললাট অষ্টমী ইন্দু, তাহাতে চন্দনবিন্দু, সেহো এক পূর্ণচন্দ্র মানি ॥ করনখ চাঁদের ঠাট, বংশী-উপর করে নাট, তার গীত মুরলীর তান। পদনখ-চন্দ্রগণ, তলে করে নর্ত্তন, নৃপরের ধনি যার গান ॥ নাচে মকর কুণ্ডল, নেত্র লীলাকমল, বিলাসী রাজা সতত নাচায়। জু-ধনু নাগা বাণ, ধনুগুণ দুই কান, নারীগণ লক্ষ্য বিধে তায় ॥ এই চাঁদের বড় নাট, পসারি চাঁদের হাট, বিনিমূলে বিলায় নিজামৃত। কাঁহো স্থিত-জ্যোৎস্নামুতে, কাঁহাকে অধরাবুতে, সব লোক

করে আপ্যায়িত ॥ বিপুল আয়তারণ, মদন-মদঘূর্ণন, মন্ত্রী যার এই দুই নয়ন। লাবণ্যকেলি-সদন, জননেত্র-রসায়ন, সুখময় গোবিন্দ-বদন ॥ যার পুণ্যপুঞ্জফলে, সে মুখদর্শন মিলে, দুই অশ্রু কি করিবে পানে। দ্বিগুণ বাঢ়ে তৃষ্ণা-লোভ, পিতে নারে মনঃশোভ, দুঃখে করে বিধির নিন্দনে ॥ না দিলেক লক্ষকোটী, সবে দিল আঁখি দুটী, তাতে দিল নিমিষ-আচ্ছাদন। বিধি জড় তপোধন, রসশূন্য তার মন, নাহি জানে যোগ্য স্মজন ॥ যে দেখিবে কৃষ্ণানন, তারে করে দিনয়ন, বিধি হঞা হেন অবিচার। মোর যদি বোল ধরে, কোটি আঁখি তার করে, তবে জানি যোগ্য সৃষ্টি তার ॥ ২।২।১০৪-১৩ ॥”

ইহাই কামগায়ত্রী-প্রকাশিত “বৃন্দাবনে অপ্ৰাকৃত নবীন মদনের” পরম-মধুর স্বরূপ। ইহা অপেক্ষা পরম-মধুরতর এক স্বরূপও রস-স্বরূপ পরম-ব্রহ্ম এই মন্থ-মন্থ নবীন-মদনের আছে। গোদাবরী-তীরে সেই রূপ এবং কামগায়ত্রী-কথিত এই নবীন-মদনের রূপ দেখিয়া কৃতার্থতা লাভ করার সৌভাগ্য রায়রামানন্দের হইয়াছিল।

“স্ববর্ণবর্ণো হেমাক্ষো বরাঙ্গচন্দনাস্রদী। সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃশাস্তো নিষ্ঠাশাস্তিপরাষণঃ ॥”-বাক্যে মহাতারত যাহার কয়েকটী বাহিরের লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছেন, “অহমেব কচিৎ ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমশ্রিতঃ। হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্ ॥”—ব্যসদেবের প্রতি এই শ্রীকৃষ্ণবাক্যে যাহার করুণার কথা উপপুরাণ ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, পুরাণ-শিরোমণি শ্রীমদভাগবত “আসন্ বর্ণাঙ্গয়োহস্ত গৃহতোহমুযুগং তনুঃ। গুরুব্রজস্তথাপীতঃ ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥”—বাক্যে যাহার সম্বন্ধে একটু ইঙ্গিত এবং “কৃষ্ণবর্ণং স্থিরাঙ্গং সাক্ষোপাঙ্গাঙ্গপার্ষদম্। যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ণনপ্রায়ৈর্যজস্তি হি সুরমেধসঃ ॥”—বাক্যে যাহার উপাস্তব্ধ এবং উপাসনার বিধি প্রচার করিয়া গিয়াছেন, “সদা পশুঃ পশুতে কৃষ্ণবর্ণং কণ্ঠারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সান্যমুপৈতি ॥”—বাক্যে ক্রান্তিও যাহার আসাধারণ প্রেমদাতৃত্বের ইঙ্গিত দিয়াছেন (শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য), সেই শ্রীশিরোমণি শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নিকটে রায়রামানন্দ করযোড়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—“এক সংশয় মোর আছেয়ে হৃদয়ে। রূপা করি কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে ॥ পহিলে দেখিঁ তোমা সন্ন্যাসিস্বরূপ। এবে তোমা দেখি মুঞি শ্রাম-গোপরূপ ॥ তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন-পঞ্চালিকা। তার গৌরকান্ত্যে তোমার সর্বঅঙ্গ ঢাকা ॥ তাহাতে প্রকট দেখি সবংশীবদন। নানাভাবে চঞ্চল তাহে কমল-নয়ন ॥ এইমত তোমা দেখি হয় চমৎকার। অকপটে কহ প্রভু কারণ ইহার ॥ ২।৮।২২০—২৪ ॥” (ইহাই রামানন্দ-দৃষ্ট কামগায়ত্রী-কথিত স্বরূপ)।

নৃসিংহদেবের নিকটে মহাভাগবত-প্রবর প্রহ্লাদ যাহাকে “ছন্নঃ কলৌ” বলিয়াছিলেন, সন্ন্যাসের বেশে প্রহ্লদ চতুর-চুড়ামণি সেই শ্রীমন্মহাপ্রভু আত্মগোপনের প্রয়াসে রামানন্দকে বলিলেন—রামানন্দ, আমি সন্ন্যাসীই অপর কেহ নই; তবে তুমি যাহা দেখিতেছ, তাহার হেতু—রাধাকৃষ্ণ তোমার গাঢ়-প্রেম। “রাধাকৃষ্ণে তোমার গাঢ়-প্রেম হয়। যাহাঁ তাহাঁ রাধাকৃষ্ণ তোমাতে সুরয় ॥ ২।৮।২২৮ ॥” কিন্তু প্রেমাজনবিচ্ছুরিত-দৃষ্টি ভক্তের নিকটে ভগবানের আত্মগোপনের প্রয়াস ব্যর্থই হইয়া থাকে। এস্থলেও তাহাই হইল। “রায় কহে তুমি প্রভু ছাড় তারিহুরি। মোর আগে নিজরূপ না করহ চুরি ॥ রাধিকার ভাবকাস্তি করি অঙ্গীকার। নিজরস আশ্বাদিতে করিয়াছ অবতার ॥ নিজ গুঢ় কার্য তোমার প্রেম আশ্বাদন। আশ্রয়সে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন। আপনে আইলে মোরে করিতে উদ্ধার। এবে কপট কর, তোমার কোন ব্যবহার ॥” ভগবান অপেক্ষা ভক্ত বেশী চতুর। প্রভু ধরা পড়িয়া গেলেন। তখন আর কি করিবেন—“তবে হাসি প্রভু তারে দেখাইলা স্বরূপ। রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ ॥ ২।৮।২২২—৩৩ ॥”

আত্মপর্যন্ত-সর্বচিত্তের অশেষ-রসায়নবারিধি শৃঙ্গার-রসরাজময়-মুষ্টিধর শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাভাব-স্বরূপা অখণ্ড-রস-বল্লভা শ্রীরাধা—এতদুভয়ের মিলিত এক অপূর্ব অনির্কচনীয় রূপে রায়-রামানন্দকে প্রভু দর্শন দিলেন। ইহাই প্রভুর স্বরূপ। এই স্বরূপে আছে—সাক্ষাৎ মন্থ-মন্থ রসিক-শেখর-ব্রজেন্দ্রনন্দনের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য, আর

আছে পূর্ণতম ভগবান্ “অপ্রাকৃত নবীন-মদনেরও” চিত্ত-চাঞ্চল্যজনক শ্রীরাধার মাধুর্য্য এবং “ছড়াছড়ি” করিয়া উত্তরোত্তর বর্ধনশীল উভয়ের সম্মিলিত মাধুর্য্য। তাই, অত্যাশ্রয়কাল পূর্বেই শ্রীরাধার অঙ্গকাঙ্ক্ষিতে আচ্ছাদিত গ্রাম-সুন্দর বংশীবদন কমল-লোচনের মদন-মোহন রূপের মাধুর্য্য দর্শন করিয়াও যিনি স্বীয় ধৈর্য্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই পরম-গম্ভীর রায়-রামানন্দ এই অদ্ভুত রূপ দেখিয়া সর্ব্বাতিশায়ী আনন্দের আধিক্য আর আশ্রয়সম্বরণ করিতে পারিলেন না। “দেখি রামানন্দ হৈলা আনন্দে মূর্ছিতে। ধরিতে না পারে দেহ, পড়িলা ভূমিতে ॥ ২৮৮২৩৪ ॥” তখন—“প্রভু তারে হস্ত স্পর্শে করাইল চেতন। সন্ন্যাসীর বেশ দেখি বিস্মিত হইল মন ॥”

প্রেমঘনবিগ্রহা শ্রীরাধা যেন প্রগাঢ় অমুরাগতাপে স্বীয় দেহকে গলাইয়া স্বীয় প্রতি অঙ্গদ্বারা রসরাজের প্রতি অঙ্গকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার গ্রাম-অঙ্গকে গৌর করিয়া দিয়াছেন। যেন ঘনীভূত-বিজলী-ঢাকা নব-জলধর। ঘনবিজলীর আবরণের ভিতর দিয়াও যেন নব-জলধরের স্নিগ্ধ গ্রামল-চ্ছটা অমুভূত হইতেছে। এ যেন এক অদ্ভুত অনির্ব্বচনীয় রূপ। রূপা করিয়া রামানন্দের নিকটে প্রভু এই রূপের পরিচয়ও দিলেন। তাঁর তত্ত্ব তিনিই জানেন। তিনি না জানাইলে কে-ই বা তাঁহাকে জানিতে পারেন? প্রভু বলিলেন—“মোর তত্ত্ব-ধীলা-রস তোমার গোচরে। অতএব এই রূপ দেখাইল তোমারে ॥ গৌর-অঙ্গ নহে মোর, রাধাঙ্গ-স্পর্শন। গোপেজ্জন্মত বিনা তেহে না স্পর্শে অণুজন ॥ তাঁর ভাবে ভাবিত আমি করি আশ্রয়ন। তবে নিজ মাধুর্য্যরস করি আশ্রয়ন ॥ ২৮৮২৩৭-৩৯ ॥” এই অদ্ভুত রূপেই রস-স্বরূপ পরব্রহ্মের পূর্ণতম অভিব্যক্তি; এই রূপেতেই প্রণবার্ধের চরমতম বিকাশ। এই চরম-তম বিকাশই নদীয়াবিনোদ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর।